নিরীক্ষা

অক্টোবর-ডিসেম্বর২০১৮

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২১তম সংখ্যা

- আরও বড়ো বিজয়ের অপেক্ষায় আছি
- গণমাধ্যম সাক্ষরতা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

নিরীক্ষা

২২১তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

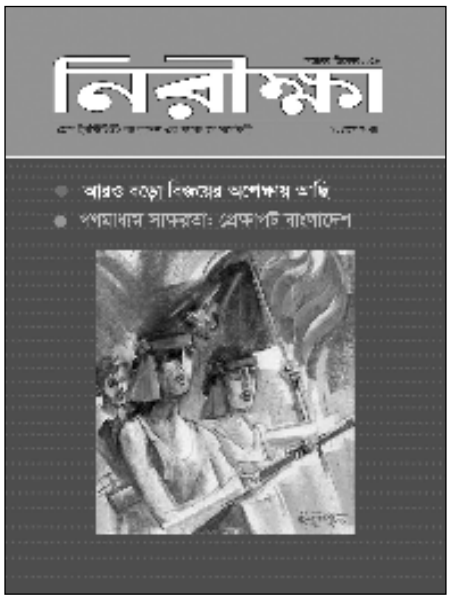

মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক সফলতা পায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এ দিনই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর করে। আর আমরা পাই চূড়ান্ত বিজয়। নিরীক্ষা'র এ সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের লেখা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়টিও এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। গণমাধ্যম বা যে কোনো মাধ্যম বিষয়ে ধারণা থাকলেই পাঠক-শ্রোতার পক্ষে জানা সম্ভব কোন সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ, কোনটি ভুয়া কিংবা গুজব। নিরীক্ষা'র এ সংখ্যায় গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, নিরীক্ষা'র পাঠকদের এ লেখাগুলো উপকারে আসবে। পাঠকদের কাজে লাগলেই আমরা আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
বিধান চন্দ্র কর্মকার

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

* প্রচ্ছদের তৈলচিত্র: শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী

সূ|চি|প|ত্র

আনন্দ ও বিষাদমাখা বিজয়ের স্মৃতি ৫
যতীন সরকার

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ৮
ডা. সারওয়ার আলী

আত্মসমর্পণের ৭২ ঘণ্টা ১০
বোরহান বিশ্বাস

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগীতে নারীর অবদান ১৩
ড. শিল্পী ভদ্র

নাটকে মুক্তিযুদ্ধ ২০
ইরানী বিশ্বাস

স্বদেশি ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কুমিল্লা এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ২২
শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

বাংলাদেশে মাধ্যম সাক্ষরতা: কী, কেন ও কীভাবে? ২৫
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে ও মামুন আ. কাইউম

সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা ধারণায়ন ও কর্মপরিকল্পনা অন্বেষণ ২৮
মাহামুদুল হক

৩৩ বিবর্তনের ধারায় মিডিয়া লিটারেসি: সেকাল ও একাল
কুদরত-ই-মওলা

৩৬ প্রসঙ্গ: গণমাধ্যম সাক্ষরতা
কামরুন নাহার

৩৯ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাধ্যম সাক্ষরতার গুরুত্ব
ড. মাহাবুবুর রহমান

৪২ ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে বিচরণে দরকার গণমাধ্যম সাক্ষরতা
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

৪৬ গণমাধ্যম সাক্ষরতা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ
মামুন অর রশিদ

৫০ গণমাধ্যম সাক্ষরতা: কী, কেন, কার জন্য?
মিনহাজ উদ্দীন

৫৪ গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা
শুভ কর্মকার

৫৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৬২ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২১তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

আনোয়ার পাশা তাঁর উপন্যাস রাইফেল রোটি আওরাত-এর এই শেষ কথাগুলো লিখেছিলেন একাত্তরের জুনের তৃতীয় সপ্তাহে। তখনই 'রাত কেটে যাবে' বলে তাঁর মনে দৃঢ়প্রত্যয় জেগেছিল। ... ছিলেন, পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র তমসার ভেতরে বসেই আপন আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা নতুন একটি প্রভাতের আগমনি রচনা করে চলেছিলেন, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে যারা পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্মের মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, তাদের অনেকেরই সৌভাগ্য হলো না সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রত্যক্ষ করার

দেখুন- পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সংখ্যাগত বিচারে অনেক অগ্রসরমান। বিশেষ করে গত তিন দশকে এর সংখ্যা বেড়েছে, যাকে আমরা বলছি 'মিডিয়া ব্যুম' হয়েছে। ক্রমবর্ধমান টেলিভিশন চ্যানেল, পত্রিকা, এফএম ও কমিউনিটি রেডিও এবং অনলাইন পোর্টালগুলো প্রতিনিয়ত সংবাদ ও মতামত তৈরি ও বণ্টন করছে। ... (বিটিআরসি) সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে এবং আট কোটি মানুষের হাতে পৌঁছেছে ইন্টারনেট

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৬

সহজভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো গণমাধ্যম এবং এর আধেয়কে বোঝা। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তা বোঝার ও সেটাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা এবং তাদের মধ্যে মিডিয়ার আধেয় তৈরির জন্য সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি করারই হলো গণমাধ্যম সাক্ষরতা। ... এবং দৃষ্টিভঙ্গি কী, নির্মাণ পদ্ধতি কী, আধেয় উপস্থাপনার ধরন কেমন, আধেয় প্রকাশ বা প্রচারের পেছনে কোনো প্রচারণামূলক উদ্দেশ্য আছে কি না

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪০

বর্তমান বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার্থীদের সংবাদ যাচাইবিষয়ক পড়ার জন্য প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সটি চালু করে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০০৬ সালে নিউজ লিটারেসি কেন্দ্র তৈরি করে, যা নিউইয়র্কের শিক্ষার্থীদের ভালো খবর বিশ্লেষক হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করে যাচ্ছে। আর এ প্রোগ্রাম সারা দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য বিদ্যালয়কে অনুপ্রাণিত করেছে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরীক্ষা'র
আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

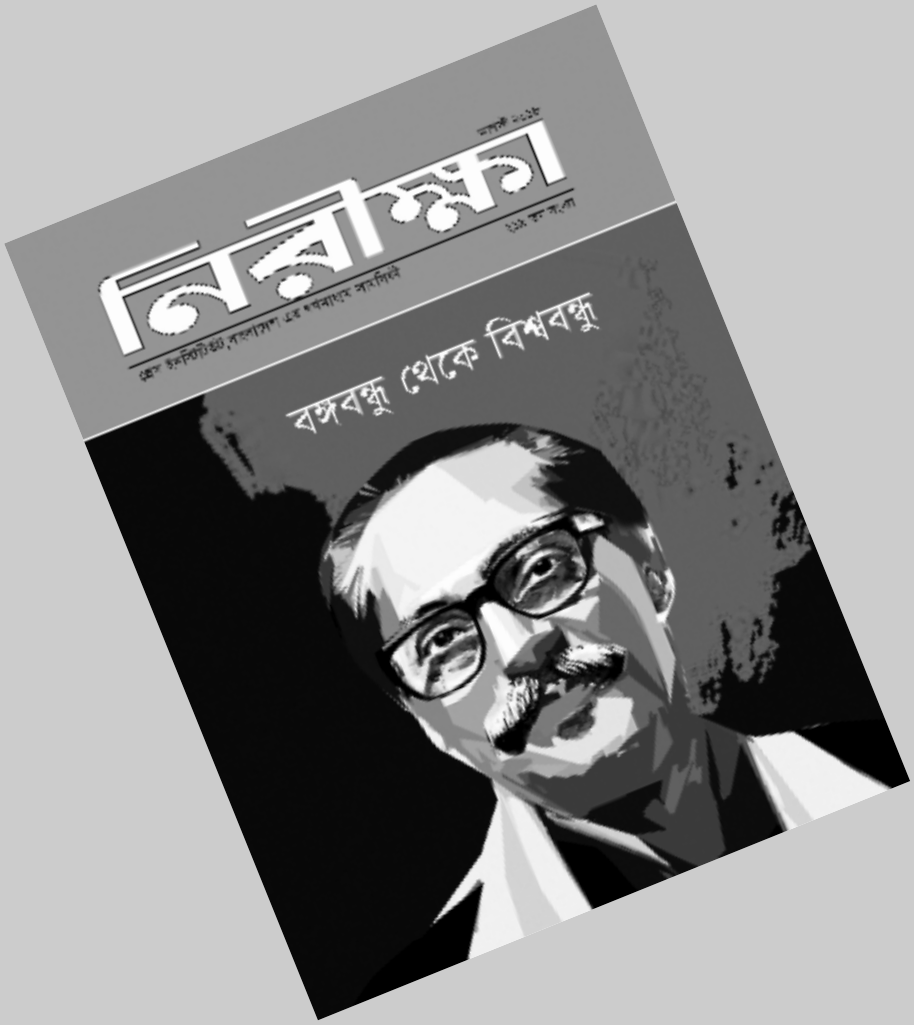

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

আনন্দ ও বিষাদমাখা বিজয়ের স্মৃতি

যতীন সরকার

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোয় আমি ছিলাম মেঘালয়ের শরণার্থীশিবিরে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ চলে মাত্র তেরো দিন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সংযোগে তৈরি হয়ে যায় যৌথ বাহিনী। এই যৌথ বাহিনীর হাতেই পতন ঘটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটে যুদ্ধের।

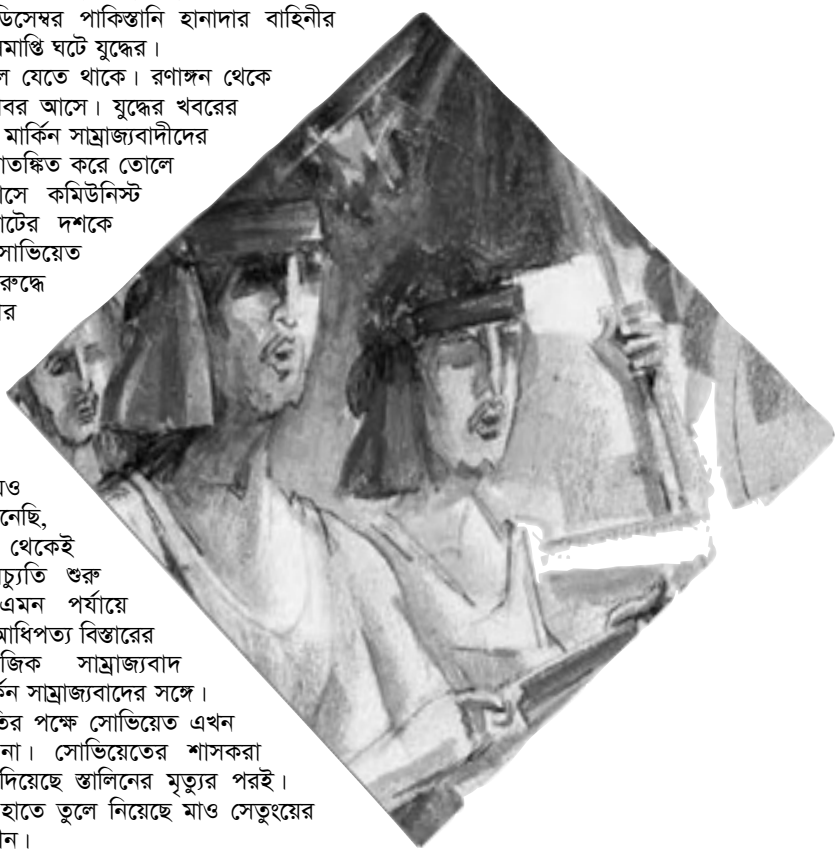

তেরোটি দিন দ্রুত চলে যেতে থাকে। রণাঙ্গন থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন খবর আসে। যুদ্ধের খবরের পাশাপাশি আমাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নানা অপতৎপরতার খবর আতঙ্কিত করে তোলে আমাদের। সেই সঙ্গে আসে কমিউনিস্ট চীনের শত্রুতার খবর। ষাটের দশকে পিকিং রিভিউয়ে সোভিয়েত 'সংশোধনবাদীদের' বিরুদ্ধে চীনের অনেক অভিযোগের কথাই পড়তাম। শুধু সংশোধনবাদী নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পরিণত হয়ে গেছে পিকিং রিভিউয়ে, সে বিষয়েও অনেক লেখা পড়েছি। জেনেছি, স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্যুতি শুরু হয়েছে। এবং বিচ্যুতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সহযোগিতা করে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। সমাজ বিপ্লব ও মানব প্রগতির পক্ষে সোভিয়েত এখন কোনো ভূমিকাই রাখবে না। সোভিয়েতের শাসকরা লেনিনের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে স্তালিনের মৃত্যুর পরই। এখন লেনিনবাদের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে মাও সেতুংয়ের মহান চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ গণচীন।

গণচীনের এ রকম গরম বক্তব্য আমাদের অবশ্যই আলোড়িত করত। সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতেও একসময়

ভাঙন ধরেছিল চীনা কমিউনিস্টদের গরম কথার তাপেই। 'সংশোধনবাদীদের' সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে 'বিপ্লবীরা' আন্ডার গ্রাউন্ড অবস্থাতেই নতুন পার্টি গড়লেন। 'সংশোধনবাদী' আর 'বিপ্লবীরা' পরস্পরের বিরুদ্ধে এত বিষোদ্গার করলেন যে, এর শতাংশের একাংশ যদি তারা ঢেলে দিতে পারতেন তাদের সাধারণ শত্রু অর্থাৎ ধনতন্ত্রী শোষকগোষ্ঠীর ওপর, তাহলে সে গোষ্ঠী কবেই উচ্ছেদ হয়ে যেত।

তবে আমাদের দেশের 'সংশোধনবাদী' কমিউনিস্ট পার্টিটি 'মস্কোর দালাল' ছিল বলেই মস্কো যতদিন কমিউনিজমের সাইনবোর্ডটি অন্তত ধরে রেখেছিল, তদ্দিন এ পার্টিতে কোনো ভাঙন দেখা দেয়নি। কিন্তু পিকিংপন্থি বলে পরিচিত বিপ্লবী কমিউনিস্টরা এক পার্টিতে মিলিত হয়ে থাকতে পারেনি, পঁয়ষট্টি থেকে একাত্তর সালের মধ্যেই বহুধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পিকিং বোধহয় বহুধা বিভক্ত পিকিংপন্থিদের কোনো অংশকেই নিরঙ্কুশ সমর্থন দেয়নি। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে তারা ভর্ৎসনার পাত্র হয়েছিল। আমাদের পিকিংপন্থিদের পিকিংপন্থা তথা মাও সেতুংয়ের চিন্তাধারার ব্যাখ্যাতেও ছিল বহু বৈচিত্র্য। সেসব বিচিত্র ব্যাখ্যার সব কিংবা কোনো একটাকে সঠিক বলে অনুমোদন দেওয়াও সম্ভবত পিকিংয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থি উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই সুবিধাবাদী, মতলববাজ ও দুর্বলচিত্ত কিছু লোক অবশ্যই ছিল। সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা অনেক আত্মঘাতী ঘটনাও ঘটিয়েছে। বামপন্থি শিবিরে অবস্থান নিয়েই কিছু লোক প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষকদের দালালিও করেছে। তবু বলতেই হবে যে, সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা ছিল প্রকৃত অর্থেই দেশপ্রেমিক, দেশের অধিকারবঞ্চিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ ও সমাজ বিপ্লবের জন্য আত্মোৎসর্গে সদা প্রস্তুত। তাই আমরা দেখেছি, একাত্তরে বামপন্থি পরিচয়দানকারী কিছু লোক যদিও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্য 'মুরগি সাপ্লাইয়ের' কাজও করেছে কেউ, তবু এ ধরনের কুলাঙ্গারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই ছিল। মস্কোপন্থি-পিকিংপন্থি নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী বরং যে যে অবস্থায় যেখান থেকে পেরেছেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালনে কেউই পিছিয়ে থাকেননি। এমনকি পিকিংপন্থিদের যে গোষ্ঠীটি মুক্তিযুদ্ধকে আখ্যা দিয়েছিল 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে, তারাও নিজেদের মতো করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, একই সঙ্গে পাক হানাদার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দিয়েছে। এদের এই আচরণকে বিভ্রান্ত, উদভ্রান্ত, উন্মাদ, হঠকারী, আত্মঘাতী, বালখিল্য কিংবা বাংলা ভাষায় প্রচলিত এ রকম হাজারও বিশেষণ প্রয়োগ করেও সঠিকভাবে প্রকাশ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তবু একান্ত স্ববিরোধী হবে জেনেও এই বিপথগামী তরুণদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। এদের বিভ্রান্তিমূলক করুণ পরিণতিতে আমি গভীর বেদনাহত হই। এরা বিপজ্জনক বিপথে পা দিয়ে নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে বটে; কিন্তু এদের লক্ষ্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি একটুও সন্দেহ পোষণ করি না।

এদের এই সর্বনাশা বিপথগামিতার জন্য বরং ধিক্কার জানাতে হয় এদের আন্তর্জাতিক মুরব্বি গণচীনের ভ্রান্তিবিলাসমত্ত নেতাদের। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এবং মার্কসবাদের বিকাশ সাধনে মাও সেতুংয়ের অবদানকে যারা পুরোপুরি অস্বীকার করেন কিংবা একান্তই খাটো করে দেখেন, আমি তাদের দলে নই। সমাজতন্ত্রের এই একান্ত দুঃসময়েও মাও সেতুংয়ের রচনাবলি পাঠ করে আমি গভীর আশবাদের উদ্দীপ্ত হই। কিন্তু সেই মাও সেতুং নেতৃত্বাধীন গণচীনই যখন বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে নিতান্তই সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার অভিযোগ উত্থাপনকারী চৈনিক নেতৃত্বই যখন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য আমেরিকার সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে মদদ দেয়, তখন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষই কি তা পারে?

আমাদের সৌভাগ্য যে, সেসময়ে 'মুক্ত বিশ্বের নেতা' 'গণতন্ত্রী' আমেরিকা ও বিপ্লবী গণচীনের বিপরীতে 'সংশোধনবাদী' ও 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত ব্লকের অন্যান্য দেশ ও সারা দুনিয়ার 'মস্কোপন্থি' কমিউনিস্ট পার্টগুলো একান্ত দৃঢ়ভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভে সহায়তা করেছিল।

ভারতের 'মস্কোপন্থি' পার্টিটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বুর্জোয়া কংগ্রেসি সরকারের কার্যক্রম সমর্থন করলেও বুর্জোয়াদের শয়তানি সম্পর্কে সচেতনতা পরিত্যাগ করেনি। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের বাংলাদেশ-প্রেম যে 'কামগন্ধহীন নিকষিত হেম' ছিল না, কমিউনিস্টরা তা বুঝত। তাই ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর অগ্রাভিযানের খবর দিতে গিয়ে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটি পত্রিকা যখন 'যশোর আমাদের দখলে', 'হিলি আমাদের দখলে' এ রকম শিরোনাম জুড়ে দিচ্ছিল, তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র কালান্তর তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপারটির প্রতিই ভারতের অনেক কমিউনিস্ট নেতা অন্তর থেকে সায় দিতে পারেননি। বাংলাদেশের মুক্তিসেনারাই তাদের মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করবে, ভারত তাদের সহায়তা করবেমাত্র– প্রগতিশীল মানুষের এ রকমই প্রত্যাশা ছিল। তবু ঘটনাপরম্পরা যখন শেষে পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্তই গড়াল এবং তৈরি হলো যৌথ বাহিনী, তখন ভারতীয় সেনাদের সকর্মক ভূমিকাকে মেনে নিতেই হলো। তবে ভারতীয় বাহিনীর ভেতর যাতে দখলদার বাহিনীর মনোবৃত্তি দেখা না দেয়, ভারতীয় বুর্জোয়াদের বৃহৎ শক্তির দম্ভ প্রকাশিত হতে না পারে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি থাকে শ্রদ্ধাবোধ– ভারতের প্রগতিশীল শক্তিগুলোর এমনটিই কাম্য ছিল। বামপন্থিরা এ ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা রেখেছিল।

পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম ঘটানোতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি অনেকেই ধরতে পারেননি। অনেক বাঘা বাঘা রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরও বোধ এ ব্যাপারে একান্ত ভোঁতা। অথচ একজন বাঙালি কথাশিল্পীর ভেতর এ বোধের জাগরণ ঘটেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরাই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদেরই ছিল মূল ভূমিকা। এ যুদ্ধে ভারতেরও মূল ও সক্রিয় সহায়তাটি এসেছিল একটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের তরফ থেকেই। তবু মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক ঘটনাধারার পর্যালোচনায় দেখা যায়, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্যবাদী বামপন্থিদের সক্রিয় সংযোগের মধ্য দিয়েই এ যুদ্ধ সফল পরিণতিতে পৌঁছেছিল, ৫৬ হাজার বর্গমাইল এলাকার একটি ভূখণ্ডে পাকিস্তান নামক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি যৌক্তিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল।

পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম ঘটানোতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি অনেকেই ধরতে পারেননি। অনেক বাঘা বাঘা রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরও বোধ এ ব্যাপারে একান্ত ভোঁতা। অথচ একজন বাঙালি কথাশিল্পীর ভেতর এ বোধের জাগরণ ঘটেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই। এই কথাশিল্পীর নাম আনোয়ার পাশা। ইনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক। অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে বসেই ইনি একাত্তরের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে রচনা করে ফেলেছিলেন একটি উপন্যাস– রাইফেল রোটি আওরাত। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম

তখনো মোটেই সংহত হয়ে ওঠেনি। তখনকার বর্তমান ছিল একান্তই সংকটময় ও ভবিষ্যৎ নিতান্তই অনিশ্চিত। তবু সেই সংকট ও অনিশ্চিতের ভেতরই কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন যে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সফল হবেই। তিনি উপন্যাসের যে নায়ক চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম সুদীপ্ত। সেই সুদীপ্ত আসলে আনোয়ার পাশারই প্রতিরূপ। সুদীপ্তও তার স্রষ্টা আনোয়ার পাশার মতোই জীবন বাঁচানোর তাগিদে হানাদারকবলিত ঢাকার এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। উপন্যাসটিতে সুদীপ্ত তথা কথাশিল্পীর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক মধ্যবিত্তের চরিত্রের নানা অসংগতির দিকগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুদীপ্তর অন্তরে ক্ষোভের অন্ত নেই। বাংলাদেশের জন্ম হোক– এমনটিই তার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। অথচ সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটার মতো অনুকূল অবস্থাও সে তার চারপাশে দেখতে পায় না। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে এসে দেখি, সুদীপ্ত পরিচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী জামাল আহমদ ও কমিউনিস্ট নেত্রী বুলার সঙ্গে। সুদীপ্ত দেখল, এই দুজনের কর্মপ্রয়াস বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে একত্র সংযুক্ত হয়েছে। আর তখনই সুদীপ্ত তথা তার স্রষ্টা আনোয়ার পাশার চকিত উপলব্ধি– 'পুরনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা, তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সেই আর কত দূরে? বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মো ভৈঃ। কেটে যাবে।'

আনোয়ার পাশা তাঁর উপন্যাস রাইফেল রোটি আওরাত-এর এই শেষ কথাগুলো লিখেছিলেন একাত্তরের জুনের তৃতীয় সপ্তাহে। তখনই 'রাত কেটে যাবে' বলে তাঁর মনে দৃঢ়প্রত্যয় জেগেছিল। এরপর ছয় মাসের মাথায়ই রাত কেটে গিয়েছিল বটে; কিন্তু আনোয়ার পাশা তা দেখে যেতে পারেননি। শুধু আনোয়ার পাশা নয়, তার মতো বোধির অনুশীলনে যারা রত ছিলেন, পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র তমসার ভেতরে বসেই আপন আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা নতুন একটি প্রভাতের আগমনি রচনা করে চলেছিলেন, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে যারা পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্মের মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, তাদের অনেকেরই সৌভাগ্য হলো না সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রত্যক্ষ করার। তার আগেই কতকগুলো অন্ধকারের জীব ওই আলোক-তাপসদের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিল।

১ ডিসেম্বরেই যে ময়মনসিংহ শহর মুক্ত হয়ে গেছে, সে খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গিয়েছিলাম। ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পর আর ভিনদেশে শরণার্থীশিবিরে বসে থাকতে পারছিলাম না। অস্থির হয়ে পড়েছিলাম মুক্ত স্বদেশের মাটি স্পর্শ করার জন্য। ১৮ কী ১৯ তারিখেই সীমান্ত পার হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম। অনুভব করলাম মানুষের অন্তরে অন্তরে বয়ে যাচ্ছে আনন্দের এক ঝরনাধারা। পরিচিত যার সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই বুকে জড়িয়ে ধরে। 'কেমন আছেন?' এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করে না। চোখ বড়ো বড়ো করে শুধু বলে, 'বেঁচে আছেন?' পাকিস্তানি বর্বরদের সেই মারণযজ্ঞের ভেতরেও যার জানটা কেবল বেঁচে রয়েছে, সেই তো মহা ভাগ্যবান। সে কেমন আছে– সে প্রশ্ন তখন একান্তই অবান্তর। কত প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর শুনতে শুনতেই না হালুয়াঘাট থেকে ময়মনসিংহ শহর পর্যন্ত পথটুকু পাড়ি দিলাম।

রাস্তার সব সেতু ও কালভার্ট ভাঙা। যুদ্ধ চলার সময় এর কতকগুলো ভেঙেছিল মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা। অবশিষ্ট ছিল যেগুলো, পাকিস্তানি সেনারা পলায়নের সময় সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। কাজেই রাস্তায় কোনো মোটরযানের চলাচল নেই। হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছিলাম দীর্ঘপথ। সারা দিন পথচলার পর সন্ধ্যা নামল সরচাপুর নামক একটি গ্রামের ধারে এসে। সে গ্রামেই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত কাটালাম। শুয়ে শুয়ে রেডিওতে খবর শুনছিলাম। হঠাৎ কানে এলো এক মর্মান্তিক সংবাদ। পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের মাত্র দুদিন আগে ১৪ই ডিসেম্বর ওদের এ দেশীয় দালালরা বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে তাঁদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। এই বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত মরদেহ পাওয়া গেছে ঢাকার রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে। সে রাতে আকাশবাণীর খবরে সম্ভবত মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, শহীদুল্লা কায়সার, ডাক্তার আলিম চৌধুরী, ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার মোর্তজা– এই কজন বুদ্ধিজীবীর শহিদ হওয়ার কথা শুনি। এরপর আরও কয়েকজনের নাম জানতে পারি। শুনি আনোয়ার পাশার নামটিও। আনোয়ার পাশার লেখার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল, তেমন কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাতে খুঁজে পাইনি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের অল্পদিন পরেই যখন সেই আনোয়ার পাশার উপন্যাস রাইফেল রোটি আওরাত প্রকাশিত হলো, তখন সেটি পড়ে যেন একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম। দিব্যদৃষ্টিতে যিনি বাংলাদেশের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন চর্মচক্ষে সেই দেশটিকে প্রাণভরে দেখার সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করল এ দেশেরই কতকগুলো মনুষ্যরূপী সারমেয়।

সম্ভবত ২০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শহরে এলাম। স্ত্রী-পুত্রসহ আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হলাম দীর্ঘ ৯ মাস পর।

একাত্তরে আমার বয়স ৩৫। এই বয়সেই ত্রিকালদর্শী দার্শনিক হয়ে গেলাম। ব্রিটিশ শাসনের অবসান আর পাকিস্তানের জন্ম দর্শন করলাম। আবার দর্শন করলাম পাকিস্তানের মৃত্যু আর বাংলাদেশের জন্মও। বাংলাদেশের জন্মের ক্ষণটিতে কিন্তু মোটেই ভাবতে পারিনি যে, অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশেই আমাকে পাকিস্তানের ভূত দেখতে হবে।

সৌজন্য: ভোরের কাগজ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত

ডা. সারওয়ার আলী

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তুতিপর্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন তার পটভূমি সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞের অংশী গণহত্যা, শরণার্থীশিবির, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বসবাসকারী দেশের মানুষের ভূমিকা। তবে যে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেসময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র, তথ্যমাধ্যম, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ইতিহাসবিদদের কাছে সমান গুরুত্ব লাভ করেনি।

সত্তরের দশকে বিশ্ব পারমাণবিক শক্তিধর দুই পরাশক্তির প্রভাববলয়ে বিভক্ত ছিল। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। আরও ছিল সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, সে যুগে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃঢ় অবস্থান লক্ষ করা যায় না। কোনো দেশে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ঘটনাবলিকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল হতো। এ সংক্রান্ত অঘোষিত বিধিনিষেধ বলবৎ ছিল। ফলে জাতিসংঘের অবস্থানও বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় থাকত। তদুপরি আজকের মতো তথ্যপ্রযুক্তি বিকশিত হয়নি, বিশ্বব্যাপী তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম মূলত সংবাদপত্র ও রেডিওর মধ্যে সীমিত ছিল। এ ধরনের পরিবেশে বাংলাদেশে গণহত্যা ও তার বিপরীতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার পঞ্চাশের দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবলয়ে অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে সিয়াটো ও সেন্টো

সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে। ষাটের দশকে মতাদর্শগত কারণে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সোভিয়েত-চীনের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে গণচীনের নেতৃত্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সমঝোতার পথে অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রে তারা প্রায়ই অভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।

এ পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও জানাবে না। তাদের এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে মানবতাবিবর্জিত ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও নীতি অধিকতর গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডসহ ২০ জন ঢাকা ও ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনীতিবিদরা ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক ভিন্নমত জানিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে চিঠি পাঠান। তারা পাকিস্তান সরকারের সত্তরের নির্বাচনের রায় অস্বীকার করা এবং গণহত্যার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের নির্লিপ্ত অবস্থানের প্রতিবাদ জানান। সেজন্য আর্চার ব্লাডকে কনসাল জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কূটনৈতিক-জীবনের প্রায় অবসান ঘটে। বরং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের জন্য চীনের সঙ্গে মৈত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে। এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জুলাইয়ে রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফরকালে অসুস্থতার ভান করে পাকিস্তান থেকে বেইজিং সফর করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন সমঝোতার আনুষ্ঠানিক পথ উন্মুক্ত করেন। পাকিস্তান সরকারের এই উপকারের প্রতিদানে রিচার্ড নিক্সন বাংলাদেশ ও উপমহাদেশ সংক্রান্ত পলিসি পেপারে নিজ হাতে লেখেন, 'To all hands, Don't squeeze at this time (R.N.).' বর্তমানে অবমুক্ত দলিলটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিষয়াদি প্রচার, বিশেষত ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থীশিবির সফরের পর সিনেট ও কংগ্রেসে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফিলাডেলফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্টজনরা পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহকারী জাহাজ প্রতিরোধের প্রয়াস নেন। এতৎসত্ত্বেও জর্দানের মাধ্যমে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের অপচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ইয়াহিয়া খানের কাছে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পত্র প্রেরণ করে নির্যাতন বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানান। তবে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে সোভিয়েতের অবস্থান সুস্পষ্ট ছিল না। তাই বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সেজন্য মে মাসে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে যুদ্ধকালীন সরকার আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রথম প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই প্রতিনিধি দলে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়। এ সম্মেলনে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিসহ পাশ্চাত্যের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও লিবারেল ডেমোক্র্যাট সংসদ সদস্য, নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা যোগদান করেন। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এছাড়া প্রতিনিধিদল পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না– বিষয়টি তুলে ধরে। কিন্তু সর্বত্র পদগর্নির বক্তব্যের বাইরে গিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেনি। এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে ৮ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। সেপ্টেম্বর থেকে ভারতে অধিকসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ শুরু হয়, যুদ্ধাস্ত্রের সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ছাড়া যৌথ বাহিনী গঠন করে সামরিক অভিযান পরিচালনার ঝুঁকি গ্রহণ করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর চূড়ান্ত উদাহরণ লক্ষ করা যায় ডিসেম্বরে জাতিসংঘে সোভিয়েতের তিনবার ভেটো প্রদান এবং বিজয়ের আগমুহূর্তে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পেছনে সোভিয়েত রণতরি তাড়া করার মধ্যে।

২.

আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরকার, সামরিক বাহিনী ও জনগণের অবদান সংক্ষিপ্ত করছি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের গবেষক ও লেখক প্রচুর গ্রন্থ রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে একটি অসংগতি রয়ে গেছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানের ভাষ্যের মিল রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি অবশ্যই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের অবদান সবচেয়ে গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ভারত সরকার সীমান্ত খুলে দিয়েছে, নচেৎ মুক্তিযুদ্ধে নিহত ও শহিদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। ভারত তার অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ স্বীকার করে এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে; মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। বাংলাদেশের জনগণের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো একজন প্রাজ্ঞ নেতা পেয়েছি এবং সেসময় ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ইন্দিরা গান্ধী। তিনি একদিকে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলোয় প্রচারাভিযান চালিয়েছেন। সত্তরের দশকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার ফলে তিনি বহু দেশে যথেষ্ট সমাদৃত হননি; কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি।

তাই বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সেজন্য মে মাসে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে যুদ্ধকালীন সরকার আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রথম প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

এতৎসত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থানের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এর পশ্চাতে সেসব দেশের গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিদেশি গণমাধ্যম বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিশ্বজনমত গড়ে তোলে, যা তাদের সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অসামান্য ভূমিকা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী পদত্যাগকারী বাঙালি কূটনীতিবিদরা ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ে অবশ্যই নিয়ামক শক্তি কিছু কুলাঙ্গার ব্যতিরেকে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সব মানুষের সমর্থনপুষ্ট মুক্তিবাহিনী ও শেষ পর্যায়ে ভারতীয় মিত্রবাহিনী। তবে আমার ধারণা, তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে এসব আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছাড়া ৯ মাসে বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না। এসব বিদেশি বন্ধুকে সম্মানিত করে বর্তমান সরকার কৃতজ্ঞ জাতিকে দায়মুক্ত করেছে।

সূত্র: ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

লেখক: ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আত্মসমর্পণের ৭২ ঘণ্টা

বোরহান বিশ্বাস

যৌথ বাহিনী বাংলাদেশের অনেকটা অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ায় কার্যত পাকিস্তানি বিমান ও নৌবাহিনী অকেজো হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মালিক জেনারেল নিয়াজিকে গভর্নর হাউসে ডেকে পাঠান। এ সময় সেনাবাহিনীর প্রেস কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাকিস্তানি বাহিনীর একটি সংকটের চিত্র তুলে ধরেন তার গ্রন্থ 'উইটনেস টু সারেন্ডার'-এ। তিনি বলেন, নিয়াজি গভর্নরের সামনে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানি বাহিনীর দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গভর্নর জানান, তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে বার্তা পাঠাবেন যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে।

পরে ৯ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এম এ মালিক ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি বার্তা পাঠান, এতে অতি দ্রুত যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন তিনি। ইয়াহিয়া খান গভর্নর মালিক ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক নিয়াজি উভয়কেই তাদের বিবেচনা মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব মার্ক হেনরি পাঁচ দফার একটি প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে– ১. অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, ২. সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৩. পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অন্যসব নাগরিক যারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে ইচ্ছুক তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৪. ১৯৪৭ সাল থেকে যারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করছে, সেসব নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং ৫. নিশ্চয়তা দিতে হবে এদের কখনো দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে না।

১৩ অথবা ১৪ ডিসেম্বর রাতে নিয়াজি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদকে অনুরোধ করেন যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ

বন্ধের পদক্ষেপ নেন। ১৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান নিয়াজির কাছে বার্তা পাঠিয়ে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

নিয়াজির কাছে প্রেসিডেন্টের বার্তা এসে পৌঁছায় বিকাল ৩টায়। এরপর নিয়াজি এবং রাও ফরমান আলী ছুটে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভেকের কাছে। তারা অনুরোধ করেন তিনি যেন ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থা করেন। স্পিভেক জানান, এ ধরনের আলোচনার যথাযোগ্য পদমর্যাদার অধিকারী তিনি নন। রাও ফরমান আলী প্রাসঙ্গিক একটি বার্তা প্রস্তুত করে এনেছিলেন। তারা বার্তাটি স্পিভেকের কাছে দিয়ে চলে আসেন।

বার্তাটিতে তারা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের জীবনহানির কথা বলে একটি মানবিক আবেদন জানান। এর সম্মানজনক সমাধানের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এ প্রস্তাবনার একটি কপি হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে রাও ফরমান আলীর হাতে দেওয়া হয় গভর্নরের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তবে বার্তাটি ভারত কর্তৃপক্ষের কাছে না দিয়ে একটি কপি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান লে. জেনারেল জ্যাকব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, ১৪ ডিসেম্বর বিকেল ৫টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতার কনসুলার অফিসের একজন কূটনীতিক তাকে স্পিভেকের সঙ্গে নিয়াজির সাক্ষাৎ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি জানান, এই সময় যুদ্ধ বন্ধ বা আত্মসমর্পণ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়। জ্যাকব তখন কলকাতায় নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের কনসুল জেনারেল হার্বার্ট গর্ডনকে টেলিফোন করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবুও জ্যাকব বিষয়টি আবার খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কনসুল জেনারেল নতুন কোনো তথ্য দেননি। এরপর জ্যাকব সেনাবাহিনী প্রধান মানেকশকে টেলিফোন করে অনুরোধ জানান, তিনি যাতে দিল্লিতে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডরের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করেন। অ্যাম্বাসেডর জানান, এ ব্যাপারে তার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে তার জানামতে, স্পিভেক তার বার্তাটি পাকিস্তানে নিয়োজিত তাদের অ্যাম্বাসেডরকে পাঠিয়েছেন এবং অ্যাম্বাসেডর তা পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে। পরে কিসিঞ্জার স্বীকার করেছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রস্তাবটি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে একদিন অপেক্ষা করতে বলেছিল।

বার্তাটি মানেকশ পান ১৫ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো– ১৫ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো সক্রিয় হয়ে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স ভারতের কাছে যুদ্ধবিরতির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে।

ওইদিন ভারতীয় আর্মি চিফ অব স্টাফ এবং মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশর কাছ থেকে ছোট্ট একটি বার্তা এসে পৌঁছাল। তাতে বলা হয়, অবিলম্বে আমার অগ্রগামী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে আপনার বাহিনী এবং অন্য ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। (পৃষ্ঠা ২৮০, গ্রন্থ: আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল)।

এদিকে জেনারেল নিয়াজি ভারতীয় ও মিত্র বাহিনী প্রধানের কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানি বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আ. হামিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১৫ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি থেকে জবাব এলো, প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক যুদ্ধবিরতি করার পরামর্শ দিচ্ছি। ঢাকায় তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে।

লে. জেনারেল নিয়াজি ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বারেককে ডেকে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন কমান্ডে পাঠানার জন্য একটা জরুরি বার্তা খসড়া তৈরির নির্দেশ দিলেন। এক পৃষ্ঠার ওই নির্দেশে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য প্রশংসা জ্ঞাপনের পর অবিলম্বে সবাইকে কাছাকাছি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হলো। এই নির্দেশে আত্মসমর্পণ শব্দ উল্লেখ করা না হলেও শেষদিকে একটি বাক্যে বলা হলো– দুঃখজনকভাবে এর অর্থ হচ্ছে সমরাস্ত্র জমা দিতে হবে। জেনারেল মানেকশ বেতার মারফত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন। আহ্বানের শেষে বলা হলো, এর পরও যদি আমার আবেদন মোতাবেক আপনি পুরো বাহিনীসহ আত্মসমর্পণ না করেন, তাহলে পূর্ণোদ্যমে আঘাত হানার জন্য আমি ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টার পর নির্দেশ দিতে বাধ্য হব। উপরন্তু জেনারেল শ'র এই আহ্বান উর্দু এবং ইংরেজিতে প্রচারপত্র আকারে বিমানে বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হলো। এ সময় পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ওয়াকআউট করে চলে আসেন।

এদিকে ১৫ ডিসেম্বর রাতে ঢাকা প্রতিরক্ষা ব্যূহ সুদৃঢ় করার দায়িত্বে থাকা ব্রিগেডিয়ার বশির অস্থির হয়ে উঠলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি অত্যন্ত দ্রুত কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে মেজর সালামতকে মিরপুর ব্রিজ পাহারা দিতে পাঠালেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, প্রয়োজনে ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। মেজর সালামত তার সৈন্য এবং ইপাকাফ সদস্যদের নিয়ে পজিশন নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই মেজর জেনারেল নাগরা তার অগ্রবর্তী কমান্ডো বাহিনী নিয়ে মিরপুর ব্রিজের অন্য পারে আমিনবাজারে এসে পৌঁছলেন। কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনীর কিছু সদস্য এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন। মেজর জেনারেল নাগরা নিয়াজির উদ্দেশে একটি চিরকুটে লিখলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর ব্রিজে। আপনার দূত পাঠান।' (পৃষ্ঠা ২৮৩, গ্রন্থ: আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল)।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরে মিরপুর ব্রিজের কাছে জেনারেল নাগরা রাস্তায় পায়চারি করার সময় মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুয়াশার মধ্য দিয়ে ঢাকা নগরীর ঝাপসা চেহারা দেখার চেষ্টা করছেন। তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে ঢাকাকে মুক্ত করার কৃতিত্ব তিনি কি লাভ করতে পারবেন? মিরপুর ব্রিজের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হরদেব সিং ক্লার, সন্ত সিং আর কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল নাগরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এই মুহূর্তে জেনারেল নিয়াজির কছে দূত পাঠাতে হবে। একটা জিপের সামনে বিরাট আকারের সাদা ফ্ল্যাগ তৈরি করা হলো। দুই কমান্ডো ব্যাটালিয়নের দুজন অফিসার ও ড্রাইভার জিপে উঠলেন। এরপর জেনারেল নাগরা একটি বার্তা নিয়াজির উদ্দেশে লিখলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর ব্রিজে। ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছে। পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেব। শিগগির আপনার প্রতিনিধি পাঠান, 'নাগরা'। সকাল পৌনে ৯টার দিকে জেনারেল নাগরা তারবার্তাটি তার এডিসির হাতে দিয়ে তাকেই নির্দেশ দিলেন জিপে নিয়াজির কাছে যাওয়ার জন্য। সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে জিপটি ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। বিস্ময়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতীয় জিপটিকে দেখছিল। ঘড়িতে তখন সকাল ৯টা। হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টাইগার বলে পরিচিত লে. জেনারেল নিয়াজি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বীরত্বসূচক মিলিটারি ক্রস বিজয়ী মেজর জেনারেল জমসেদ, ধূর্ত মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং নৌবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ। জেনারেল নাগরার বার্তা হাতে নিয়ে পড়ার পর নিয়াজির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি কোনো কথা না বলে চিঠিটা অন্যদের পড়ার জন্য দিলেন। উপস্থিত সবাই বার্তাটা দেখলেন। মিনিট কয়েকের জন্য সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

রাও ফরমান প্রথমে কথা বললেন। তাহলে, জেনারেল নাগরাই আলোচনার জন্য এসেছে? কেউই এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানাবেন নাকি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবেন? জেনারেল নিয়াজিকে উদ্দেশ করে আবার রাও ফরমান জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাতে কি ঢাকার জন্য কিছু রিজার্ভ সৈন্য আছে? নিয়াজি এবারও কোনো জবাব দিলেন না। শুধু জেনারেল জমসেদের দিকে তাকালেন। জমসেদ মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যুদ্ধ করার মতো ঢাকায় আর কোনো রিজার্ভ সৈন্য নেই। রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ এবং রাও ফরমান প্রায় একই সঙ্গে বললেন, এই যখন পরিস্থিতি তাহলে নাগরা যা বলছে তাই করুন। (পৃষ্ঠা ২১০, গ্রন্থ: উইটনেস টু সারেন্ডার, সিদ্দিক সালিক)। শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, জেনারেল জমসেদ যাবেন জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সঙ্গে সঙ্গে মিরপুর ব্রিজ এলাকায় প্রহরারত পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে জরুরি নির্দেশ পাঠানো হলো। যুদ্ধবিরতির কথাবার্তা হচ্ছে, তাই জেনারেল নাগরার ঢাকা নগরীতে প্রবেশের সময় যেন কোনো বাধা দেওয়া না হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে, একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা নগরীতে মনোবলহীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ একটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। যা হোক, একটু পরেই সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর জিপ মিরপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে দুই কমান্ডো বাহিনী গুলি শুরু করলে অনেক কষ্টে তাদের বিরত করা হলো। জিপ থেকে একজন পাকিস্তানি মেজর নেমে জেনারেল নাগরাকে স্যালুট দিয়ে নিয়াজির আত্মসমর্পণের বার্তা দিয়ে জানাল, ব্রিজের পশ্চিম পাশে লে. নিয়াজির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মেজর জেনারেল জমসেদ অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই জেনারেল নাগরা, কাদের সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার ক্লার সাদা ফ্ল্যাগওয়ালা জিপে মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম পাশে এসে উপস্থিত হলেন।

জিওসি জমসেদ তাদের ঢাকা নগরীতে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের স্টাফ গাড়িতে বসার অনুরোধ করলেন। তখন সকাল সাড়ে ১০টা। জেনারেল নাগরাকে নিয়ে জিপ ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে আসার পর ব্রিগেডিয়ার বারেক সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি সাজানো কক্ষে বসতে অনুরোধ করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লে. জেনারেল নিয়াজি আন্ডার গ্রাউন্ড টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টার থেকে নিজ অফিসে এসে হাজির হলেন। জেনারেল নাগরা ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে করে মেজর জেনারেল জমসেদ এসে ঘরে ঢুকতেই নিয়াজি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে নাগরার সঙ্গে করমর্দন করে কেঁদে ওঠেন। নিয়াজি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পিন্ডিতে হেডকোয়ার্টারের বেজন্মারা আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী।' নিয়াজির কান্না থামিয়ে জেনারেল নাগরা তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। প্রথমেই কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী। নাগরা যখন কাদের সিদ্দিকীর পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল জমসেদ আর ব্রিগেডিয়ার বারেক এই বাঙালি যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলেন। জেনারেল নাগরা তার বক্তব্যের শেষে বললেন, 'এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।' জেনারেল নিয়াজি করমর্দনের জন্য কাদের সিদ্দিকীর দিকে হাত এগিয়ে দিলেন। সবাইকে হতবাক করে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা তার হাত সরিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'যারা নারী ও শিশুহত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আমি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিকারী হতে চাই না।'

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, দুপুর প্রায় ১২টা। কলকাতার থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে খবর এসে পৌঁছল, ঢাকায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে। এই মুহূর্তে মিত্রবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক জেনারেল নাগরা এবং কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে আছেন। সবদিকে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল (অব.) ওসমানীকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ওসমানী তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একান্তে আলাপ করে সবশেষে বললেন, নো নো প্রাইম মিনিস্টার, মাই লাইফ ইজ ভেরি প্রেসাস, আই কান্ট গো (না, না প্রধানমন্ত্রী, আমার জীবনের মূল্য খুব বেশি আমি যেতে পারব না। (পৃষ্ঠা ২৮৭, গ্রন্থ: আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল)। তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠান। হঠাৎ খবর এলো, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বিশেষ আর্মি হেলিকপ্টারে মেজর জেনারেল জ্যাকব এসে পৌঁছবেন। দুপুর ১টায় ব্রিগেডিয়ার বারেক তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে জেনারেল জ্যাকব এবং কর্নেল খেরাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। জ্যাকবের হাতে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের দলিল। জেনারেল নিয়াজি এই দলিলকে যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করলেন। জেনারেল জ্যাকব দলিলটি সবার সামনে ব্রিগেডিয়ার বারেকের হাতে দিলেন। বারেক জেনারেল রাও ফরমান আলীর টেবিলে দলিলটা খুলে ধরলেন। রাও ফরমান আলী আপত্তি তুলে বললেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের জয়েন্ট কমান্ডারের কাছে কথাটা তো থাকতে পারে না? আমরা তো ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করব।' জেনারেল জ্যাকব উত্তরে বললেন, 'দিল্লি থেকে এভাবেই দলিল তৈরি হয়ে এসেছে। এর কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' কর্নেল খেরা বলে উঠলেন, এটা তো আমাদের আর বাংলাদেশের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা মাত্র। এরপর জেনারেল নিয়াজি দলিলটা একনজর দেখে কোনো মন্তব্য না করে রাও ফরমানের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। জেনারেল ফরমান তার বসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কমান্ডারই বলতে পারবেন, তিনি এই দলিল মেনে নেবেন, না প্রত্যাখ্যান করবেন?' জেনারেল নিয়াজি কোনো জবাবই দিলেন না। প্রায় ১০-১৫ সেকেন্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ইশারা দিলেন। উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন, টাইগার নিয়াজি নামে খ্যাত জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়েছেন।

বেলা ৩টায় ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সস্ত্রীক হেলিকপ্টারে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে হাজির হলেন। লে. জেনারেল নিয়াজি তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্যালুট করার পর করমর্দন করলেন। বিকাল সোয়া ৪টা নাগাদ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে নিয়াজি ও অন্যদের সঙ্গে করে জোর কদমে এগিয়ে চললেন আত্মসমর্পণ মঞ্চের দিকে।

১৬ই ডিসেম্বর, বিকেল ৪টা ৩১ মিনিট। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল নিয়াজি মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর প্রধান (বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড) জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে দলিলে স্বাক্ষর করলেন। লাখ লাখ জনতা এবং শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক তখন সেখানে উপস্থিত। এরপর দুপক্ষের সেনাপতিরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজি তার রিভলবার জেনারেল অরোরার হাতে দিয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করলেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজ খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করল। আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে তখন উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খন্দকার। তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান নিয়ে বীর উত্তম এ কে খন্দকার তার 'বিজয়ের স্মৃতি, যেভাবে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো' লেখার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন– 'অনুষ্ঠানের (আত্মসমর্পণ) তেমন কোনো আড়ম্বর ছিল না, ছিল না কোনো বিশেষ আয়োজন। মাত্র দুটি চেয়ার আর একটি টেবিল। মানুষের ভিড়ে অতিথিবর্গের দাঁড়িয়ে থাকাটা কঠিন ছিল। আমি ও ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল নন্দী, এয়ার মার্শাল দেওয়ান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর পাশেই ছিলেন লে. জেনারেল এফ আর জ্যাকব। জনতার চাপে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছিল। আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে আসা হলো। প্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান লে. জেনারেল আমির খান নিয়াজি এবং পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা স্বাক্ষর করলেন। স্বাক্ষর শেষ হলে উভয়েই উঠে দাঁড়ালেন। স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণের দলিল লে. জেনারেল আমির খান নিয়াজি, লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিলেন। তারপর আত্মসমর্পণের রীতি অনুযায়ী লে. জেনারেল আমির খান নিয়াজি নিজের রিভলবারটি কাঁপা কাঁপা হাতে অত্যন্ত বিষণ্ণতার সঙ্গে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানি বাহিনীর সেনা সদস্যদের ঘেরাও করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।'

বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ দলিলের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

The Pakistan eastern command agree to surrender all Pakistan armed forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Aurora General, officer-commanding in chief of the Indian and Bangladesh forces in the eastern theatre, This surrender includes all Pakistan land, air and naval forces and civil armed forces. They are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General Jagjit Singh.

The Pakistan eastern command shall come under orders of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora as soon as this instrument has been signed, Disobedience of orders will be regarded as breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of surrender terms.

Lieutenant General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnels who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the Geneva Convention and guarantees the safety and well-being of all Pakistan military and para-military forces who surrenders, protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnels of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora.

লেখক: সাংবাদিক, ভোরের কাগজ

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগীতে নারীর অবদান

ড. শিল্পী ভদ্র

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সব উল্লেখযোগ্য ঘটনায় প্রত্যক্ষে আমরা নারীদের উপস্থিতি হয়তো তেমন দেখিনি। কিন্তু নারী মা-স্ত্রী-বোন-সহকর্মী-সহযোদ্ধা হিসেবে নীরবে কাজ করে গেছেন। যে যোদ্ধা যুদ্ধে গেছেন, তার পরিবারপরিজনের ঘর আগলে রেখেছেন তো কোনো না কোনো নারী; তিনি মা-বোন-স্ত্রী যে-ই হোন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সরবরাহ করে, অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে, মমতা দিয়ে, সেবা দিয়ে, মনোবল জুগিয়ে– নানাভাবে রক্ষা করেছে এই নারীসমাজ। নারীর আত্মত্যাগ ছাড়া কোনো কাজই সঠিকভাবে সম্ভব নয়। নেপথ্যে থেকে নারীসমাজ কাজ করেছে বলে হয়তো তাদের নামগুলো অজানাই রয়ে গিছে। গৃহকোণ থেকে বাইরে নারীদের পদচারণা অনেকেরই অপছন্দ, অনেকটা নিন্দনীয়। তারপরও আমরা দেখি রাজনীতি, সমাজসেবা, সংসদ সদস্য, নারীনেতৃত্ব, গবেষণা, লেখালেখি, সংগীত ও নৃত্যশিল্প, শিক্ষক, অভিনয়, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর দৃপ্ত পদচারণা।

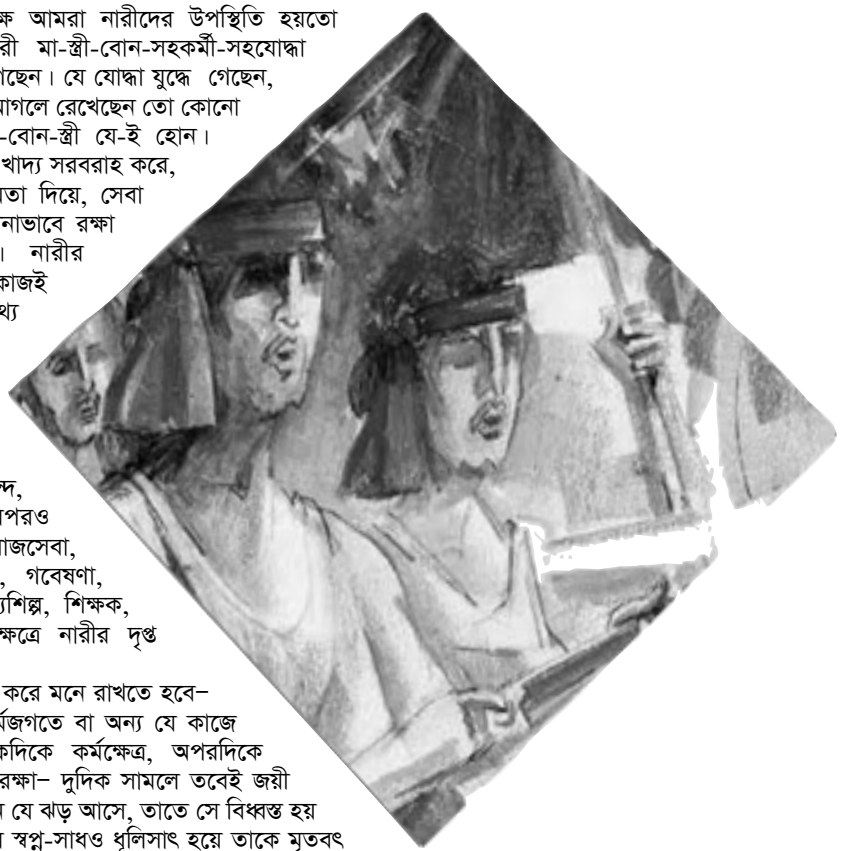

একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে– নারী গৃহ ছেড়ে বাইরের কর্মজগতে বা অন্য যে কাজে যান না কেন, তাকে একদিকে কর্মক্ষেত্র, অপরদিকে নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা– দুদিক সামলে তবেই জয়ী হতে হয়। নইলে তার জীবনে যে ঝড় আসে, তাতে সে বিধ্বস্ত হয় তো বটেই; সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বপ্ন-সাধও ধূলিসাৎ হয়ে তাকে মৃতবৎ জীবনযাপন করতে হয়। এভাবে অনেক সম্ভাবনাময় ফুল ফুটে না, অকালেই ঝরে পড়ে বা অন্তরালে থাকতে বাধ্য হয়। আবার কেউ কেউ

আত্মহননের পথে পা রাড়ায়। তবে জীবনবাজি রেখে বেরিয়েও আসে অনেক সাহসী নারী। আমরা বহির্বিশ্বের কথা বাদ দিয়ে শুধু এই উপমহাদেশেই এমন অনেক নারীর কথা স্মরণ করতে পারি, যারা আপন মহিমায় ভাস্বর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথাই ধরা যাক, ভারতবর্ষের ইন্দিরা গান্ধীর মানবিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সহানুভূতি যেভাবে কার্যকর ছিল, তা তুলনাহীন। আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামের ইতিহাসে, বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বাংলার ইতিহাসের ধারায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দিতে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ ফজিলাতুনেছার বক্তব্যের স্মৃতিচারণে জননেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য উল্লেখ্য–

> 'আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে, তাই তুমি বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও, নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে, সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, ভরসা করে। মায়ের এ কথাগুলো আজও আমার কানে বাজে। কত বাস্তবধর্মী চিন্তাভাবনা তিনি করতেন এবং একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক তিনি ছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন।'[১]

উপরিউক্ত বক্তব্য 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাস ও তত্ত্ব' নামক বইয়ের আখরে প্রকাশিত হয়েছে ২০১৪ সালে। তাই অসংখ্য মানুষ আজ জানতে পেরেছে। নইলে নিভৃতেই থেকে যেত এ মহীয়সীর অবদান। বাংলায় প্রবাদ আছে– 'রাজা চালায় রাজ্য, রাজারে চালায় রানী।' কথাটির সত্যতা প্রমাণের জন্যই বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু জীবনসঙ্গী, প্রিয়তম পত্নী শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিবের বক্তব্য উপরে তুলে ধরা হলো।

জননেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, সাজেদা চৌধুরী, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, প্রীতিলতা, তারামন বিবি বীরপ্রতীক, ডাক্তার ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম বীরপ্রতীক। গোবরা ক্যাম্পে অস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গীতা মজুমদার, গীতা কর, শিরিন বানু মিতিল, মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি, মুক্তিযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা (যারা গ্রেনেড চার্জ করে গানবোট উড়িয়ে দিয়েছিলেন)। আলেয়া বেগম ও শিরিন বানু (মিতিল) পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেন। জানা যায়,

'মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন স্বাধীনতার ২৮ বছর পর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছেন, আলমতাজ বেগম ছবি ছিলেন একাত্তরের গেরিলাযোদ্ধা, নির্ভীক মুক্তিসেনা ছিলেন বরিশালের করুণা বেগম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'সেনা সাব সেক্টর মহিলা মুক্তি ফৌজ সহায়ক কমিটির নকশা'[২] প্রভৃতি দৃষ্টান্তের কথা।

উপরিউক্তে নারী-অবদানের কিছু খণ্ডচিত্র এসেছে মাত্র। অবগুণ্ঠিত নারী গৃহাভ্যন্তরে থেকেও নানাভাবে যোদ্ধা। গৃহযুদ্ধে নারীকেই প্রধান যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে বাধ্যবাধকতা দিয়ে। সে সংগ্রামে শিশু, কিশোরী বলে ক্ষমা পায়নি নারী তার কর্ম-কর্তব্য যুদ্ধে। ঘর-পরিবার-সমাজ সামলে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বেগম রোকেয়ার হাত ধরে ভারতবর্ষের নারী বেরিয়ে এলো শিক্ষার অঙ্গনে। সেটা সহজ ছিল না মোটেও। সেখানে জোরদার ছিল নানা অপব্যাখ্যা– লেখাপড়া করলে হিন্দু নারীর স্বামী মারা যায় কিংবা মুসলমান নারীদের বাংলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ প্রভৃতি নানা কুসংস্কার। বেগম রোকেয়া ছিলেন রক্ষণশীল, সম্ভ্রান্ত মুসলিম গার্হস্থ্য পরিবারের সন্তান। তাদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু-ফারসি এবং সে পরিবারে মেয়েদের বাংলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। অথচ এই রক্ষণশীল ও ধার্মিকতার আবহে বড়ো হয়েও তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষাই নারীমুক্তির পথ। বাঙালি বলতে তিনি হিন্দু-মুসলমান ভেদ না করে সবাই বাঙালি— এমন উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন তিনি। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'ঈদ সম্মিলন' প্রবন্ধে বলেছেন,

> 'এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিনে হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বাঙালি একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি?'[৩]

তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন তার স্কুলে পড়ানোর জন্য। কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান তাকে সইতে হয়েছে, তবু তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেই কাজ করে গেছেন। নারীশিক্ষার আলোকের দীপ্ত শিখায় নিজেকে তৈরি করেছেন বাহির সমরে অংশগ্রহণের প্রয়োজনে। এ প্রসঙ্গে বলে শেষ করা যাবে না। তবে সাতচল্লিশের আগস্টে দেশ বিভাগের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। বলছি এজন্য যে, নারীর অবদান প্রতিটি ঘর, দিন, ঘণ্টায় অনস্বীকার্য। তাদের অবদানকে অবনত শিরে অভিবাদন। এক্ষেত্রে সবার নাম বা অবদান বলা হয়তো যাবে না, তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে ব্যর্থতাজনিত কারণে, তবু স্বল্প পরিসরে কিছু তুলে ধরার প্রয়াস থাকল:

নব্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানে নারীনেত্রী আক্তার ইমামের নেতৃত্বে নারীসমাজ 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে না দিতেই ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ যখন রেসকোর্স ময়দানে বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', তখনই ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয় স্লোগান এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আসলে চল্লিশের দশকেই

> 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের সংগ্রামী ভূমিকা' নিয়ে প্রকাশিত বইয়ে হাজার হাজার নারীর নাম এসেছে। রাজনৈতিক দলের কর্মী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, সংসদ সদস্য, নারীনেত্রী, গবেষক, লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রী প্রমুখ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষিত নারীরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এ যেমন সত্য আবার মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন স্বাধীনতার ২৮ বছর পর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছেন এ-ও সত্য

জনসংগীতের যে নতুন ধারার সূচনা হয়; সে সংগীতচর্চায় নারীসমাজের অবদান অনেক। তখন নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবেই সংগীত পরিবেশন করতেন। তাদের মধ্যে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা রায় চৌধুরী, জলি বাগচী, রুমা গুহ ঠাকুরতা, রত্না ভট্টাচার্য, শিমুল ইউসুফ, বিষ্ণু রেবা, সুমিতা ভট্টাচার্য, শাহীন সামাদ, কল্যাণী ঘোষ, শাহানাজ রহমতুল্লাহ, জয়ন্তী ভূঁইয়া, বীণা রায় চৌধুরী, বুলবুল মহলানবীশসহ অনেকের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এর রেশ ধরেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রী-জনতা ১৪৪ ধারা ভাঙার মানসে সিদ্ধান্ত নিল চারজন করে বাইরে যাওয়ার। সেদিনও নারীসমাজ সে কাতারে এগিয়ে যেতে ভয় পায়নি, এর সত্যতা রয়েছে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের বক্তব্যে–

> '১৪-১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী গর্জে উঠল ভাঙার পক্ষে। সিদ্ধান্ত হলো চারজন করে বাইরে যাওয়ার। মেডিক্যাল কলেজ গেট ১০০ গজ দূরত্বের ব্যবধানে পৌঁছতে পুলিশের বাধার মুখে ৩-৪ ঘণ্টা লাগে। মেডিক্যাল অভিমুখে হঠাৎ করে মানুষের ঢল নামে। এর মধ্যে আচমকা গুলি। মুখ থুবড়ে পড়ে বরকতসহ কয়েকজন। পরের দিন বরকত মারা যায়।'[৪]

জানা যায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গে রওশন আরা বাচ্চু, আনোয়ারা প্রভৃতি বীর নারীর নাম। পশ্চিম বাংলার গণশিল্পী দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সুরে একটি গানে রয়েছে:

> 'আমার বাংলাদেশ– সোনার বাংলাদেশ
> অগ্নিদেশ বাংলাদেশ ক্ষুদিরামের বাংলাদেশ

রোশনারার বাংলাদেশ বাংলাদেশ কথা দিলাম
শুধবো ঋণ লক্ষ প্রাণ রক্ত বারুদ কথা দিলাম
বীর জননী বাংলাদেশ অহল্যা মা বাংলাদেশ ॥'

আবার আবদুল লতিফের গানেও রয়েছে সে কথা–
'ধু ধু বাংলায় ডাক দিয়ে যায় রক্তের দিনগুলি
মিছিলে সেদিন আমার ভাইয়ের বুকে বিঁধেছিল গুলি। ...
ক্ষুধা হাহাকারে আসাদ-জহুর-রুস্তম-মতিউর
আনোয়ারা-জোহা আলো জ্বালো পথে দুর্গম বন্ধুর
বজ্রশপথে খামারে খামারে এসো সূর্যেরা জ্বলি
রক্তের দিনগুলি।'

অথবা তাঁর লেখা,
'আমার দেশের ছাত্র ছাত্রীর নাই তুলনা নাই,
ওরা- বছর বছর মরছে বলে আমরা বেঁচে যাই ॥
তোদের স্মৃতির মিনার গড়ে
বুকে বুকে যতন করে রাইখা দিছি ভাই।'

জানা যায়, '৫২-র ২২ ফেব্রুয়ারিতে অজয় দাস লেনের এক বাড়িতে মহিলারা বিকাল ৪টায় যোগ দেন। লিফলেটে লেখা ছিল 'নূরুল আমিনের রক্ত চাই'। সে সভায় সুফিয়া কামাল, রোকাইয়া আনোয়ারা, দৌলতুন্নেছা খাতুন, নূরজাহান মুরশিদ, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন, সন্‌জীদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। '৫৩ সালে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে নারীরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে একাত্মতা জানিয়ে মিছিল নিয়ে যাত্রা করেছিল আরমানিটোলা ময়দান অভিমুখে। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন। '৫৪-র নির্বাচনের পর অনেক কারাবন্দি মুক্ত হয়েছিলেন। রাজবন্দিদের বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয় সদরঘাট বার লাইব্রেরিতে। সেখানে কাজী মদিনা আবৃত্তি করেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়। এই ৫৪ সালের নির্বাচান প্রচারণায় সংস্কৃতি কর্মীদলের বিরাট ভূমিকা ছিল। আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান, অজিত রায়, সুখেন্দু চক্রবর্তী অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে গান শেখাতেন। সেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন। বস্তুত, চল্লিশের দশকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যাত্রা শুরু করে। সংগীত, নাটক, সাহিত্য, নৃত্য– সব অঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ফরিদা বারি মালিক আর কামরুন্নাহার লাইলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করেন। ভয় ঘিরে ছিল তবু মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গান গেয়ে শহিদ মিনারে গিয়েছেন। গান গেয়ে যাওয়ার সময় ঘরের শিশুরা মিছিলের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে নিজেদের অজান্তে। এ আবেগতাড়িত গান অনুপম উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল সবার মনে–

> 'আজিমপুর এলাকায় সরকারি চাকুরেরা নীরব দর্শক হয়ে থাকবার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু ভোররাত্রে পথের মিছিলের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাদের ঘরের শিশুরাও গেয়ে উঠেছে, আমি কি ভুলিতে পারি। বিস্মিত পিতামাতা তখন শিহরিত হয়ে উঠেছেন অনিবার্য আবেগে।'[৫]

১৯৫৯ সালের বিরূপ পরিবেশেও মেয়েরা প্রভাতফেরিতে গান গেয়ে অংশগ্রহণ বাদ দেননি। কাজী মদিনা, তামান্না, সেলিনা, বীথি– তাদের উপস্থিতির কথা জানা যায়। ষাটের দশকে ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরেক প্রতিবাদী সংগ্রামে রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে সনজীদা খাতুন বলেন–

> 'বৈরী পরিস্থিতির কাছে মার খেয়ে বাঙালিয়ানার দৃপ্ত চৈতন্যে ঐকান্তিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে গান গেয়েছি আমরা। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এই চেতনা দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হয়েছিল রবীন্দ্রশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে। সমগ্র বিশ্ব যখন রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালন করছে, তখন এদেশের উদযাপন কমিটির সভানেত্রী সুফিয়া কামালকে ডেকে নিয়ে ধমক দিচ্ছেন চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদ! কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। সুফিয়া কামালকে দমন করা যায়নি। সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়েছিল উৎসব। ফলে তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে এদেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সংঘশক্তি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনের শপথ নিয়েছিল সেদিন, জন্ম হয়েছিল 'ছায়ানটের'। 'ছায়ানট' বুঝতে পেরেছিল ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হলে ঐতিহ্য স্মরণের আয়োজন করা জরুরি। সেই জন্যই একষট্টি সালে সংগঠিত ছায়ানট প্রথমে পুরোনো গানের আসর করেছিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে।'[৬]

বাঙালির ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যই 'ছায়ানট' বসন্তোৎসব, শারদোৎসব, বর্ষার গানের আসর, বাঙালির জাতীয় উৎসব, নববর্ষ পালন শুরু করে গানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য– দেশের মানুষকে দেশজ ঐতিহ্য-সচেতন করে তোলা। 'শ্রোতার আসর' নামের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাঙালির সংগীত ধারার পরিচয় তুলে ধরা হলো শ্রোতাদের সকাশে। এখানে পরিবেশিত হয়েছিল ফিরোজা বেগমের নজরুলগীতি, ফাহমিদা খাতুন, জাহিদুর রহিম, মালেকা আজিম খানদের রবীন্দ্রসংগীত, খাদেম হোসেন খানের সেতার, বারীণ মজুমদার-ইয়াসীন খানের রাগসংগীত প্রভৃতি। 'শ্রোতার আসরে' বিচিত্র সংগীত সমাবেশ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' সূত্রে জন্ম নেওয়া 'ছায়ানট' কেবল রবীন্দ্রচর্চা করেনি। হয়তো 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠায় বাঙালিয়ানার প্রতিষ্ঠা কতটা হয়েছিল, তা বোঝা যায়নি সাদা চোখে, কারণ–

> 'চোখে দেখা যায় না তা। সংস্কৃতি কাজ করে ভেতরে ভেতরে। আজকের অসংখ্য রবীন্দ্র-নজরুলসংগীতশিল্পী তাদের সাধনাতে বাঙালির সংগীত ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। ওই সাধনাই তো সাংস্কৃতিক আন্দোলন।'[৭]

সাংস্কৃতিক আন্দোলন কিন্তু জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, সেজন্যই সাংস্কৃতিককর্মীরা মানুষের বিপদে বারবার সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ান। তখন বিশ্বের সব সাংস্কৃতিককর্মী যেন এক সুতায় বাঁধা পড়েন, যেন এক পরিবারের লোক হয়ে যান। পরিবারের বিপদ-ত্রাণে তারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে গান গেয়ে, সেতার বাজিয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে, স্লোগান দিয়ে– যিনি যেভাবে পারেন, শিল্পসম্মত উপায়ে সহযোগিতায় পাশে এসে দাঁড়ান আপনজনের মতো। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্র অনুরাগী 'বিজয়া' তথা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামের আর্জেন্টিনার খ্যাতনামা লেখকের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে একটি মিছিলের পুরোভাগে থাকার দৃশ্য। বাংলাদেশে ৭১ এ গণহত্যা বিরোধী অবিস্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যায় (১ আগস্ট, ১৯৭১) কণ্ঠশিল্পী জোয়ানবেজ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অংশ নিতে পারেননি। কারণ ওইদিন তার পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান ছিল। জোয়ান ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতিবাদী আর মানবতার সপক্ষে। তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ হৃদয়ে উপলব্ধি করে লিখেছিলেন এক হৃদয়বিদারক সংগীত-আলেখ্য। গানের প্রথম কয়েকটি লাইন:

'বাংলাদেশ ... সূর্য অস্ত যায় পশ্চিম আকাশে
বাংলাদেশে লক্ষ মানুষের চিতা জ্বলে
আমরা অকর্মণ্য, সরে দাঁড়াই।
শুধু মরণযজ্ঞের দর্শক
দেখি কিশোরী জননীর শূন্যদৃষ্টি
চেয়ে থাকে দুর্বল শিশুর দিকে।'

উপরিউক্ত 'বাংলাদেশ' গানটির সুরকার তিনিই, গেয়েছেনও তিনি। হয়তো একজন শিল্পী বলেই তিনি এমন মর্মস্পর্শী গান লিখেছিলেন! লন্ডনের অ্যালবার্ট হল, বার্লিনের আলেকজান্ডার প্ল্যাৎসা, দিল্লির সংগীত নাটক একাডেমি অথবা কলকাতার রবীন্দ্রসদন মুখরিত হয়েছিল বাংলাদেশের সপক্ষে সংস্কৃতির প্রতিরোধ-চেতনায়। সেদিন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরুষের পাশে নারীরাও সোচ্চার হয়েছিলেন। লতা মুঙ্গেশকর, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজা বেগম, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫- ১৯৮৯), সাধনা রায় চৌধুরী, গীতা মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী ভৌমিক (যিনি অ্যালেন গিন্সবার্গের লেখা 'September on Jessore Road' কবিতাটির ভাবানুবাদে বিখ্যাত 'যশোর রোড' গানটি গান) জয়ন্তী ভূঁইয়া, বীণা রায় চৌধুরী যারা শরণার্থী শিবিরে গান পরিবেশন করতেন। 'ছায়ানট'এর শিল্পী-কর্মীরা রাজপথে ভুখামিছিল করে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিয়েছেন। তেমনি একে একে সৃষ্টি হয়েছে ঐকগান, সৃজনি, আমরা কজনা, ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী প্রভৃতি। একদিকে সংস্কৃতিচর্চা,

অন্যদিকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে সমাজ পরিবর্তনে লড়ে গিয়েছেন এসব সংগঠনের কর্মীরা। ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর সত্যেন সেনের 'উদীচী' প্রতিষ্ঠিত হয়। নবসংস্কৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী' মানবমুক্তির পথে এগিয়ে চলে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন, তন্মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, আবুল ফজল, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, আবু জাফর শামসুদ্দিন, কবির চৌধুরী, কলিম শরাফী, শেখ লুতফর রহমান, আনিসুজ্জামান, আলতাফ হোসেন, জাহিদুর রহমান, আবদুল লতিফ, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী, গোলাম মোহাম্মদ ইদু আর নারীদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, সনজীদা খাতুন, অনিমা সিংহ প্রমুখ। উদীচীর নেতৃত্বে অনেক শিল্পীই আত্মপ্রকাশ করেছেন। নারীদের মধ্যে ছিলেন– রাবিয়া বেগম, তরু আহমেদ, জিনাত জাহান, লায়লা হাসান, রিজিয়া বেগম, শাম্মী পারভেজ, রোকেয়া, মম, সেলিনা, শামীম, শাহানা, হেলেনা, লীনা, মরিয়ম, আভা মণ্ডল, শিবানী ভট্টাচার্য, এন রাশেদা প্রমুখ।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করাটা বাঙালির জীবন-মরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। অস্তিত্ব মোকাবিলায় বাঙালির চেতনা জয়ী হলো। তারা আবিষ্কার করল এদেশের সংস্কৃতির প্রতীক, বাঙালির জাতীয় সংগ্রামের উৎস রবীন্দ্রনাথ। নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জেগে উঠল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গেয়ে। ১৯৬১ সালের আত্মোপলব্ধির এই নবশক্তি, ১৯৬২তে ছাত্রছাত্রীদের সামরিক শাসন লঙ্ঘনের ঐতিহাসিক সাফল্য এনেছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুবের পতন হয় সুনিশ্চিত। এই পতনের পশ্চাতে উৎস শক্তি ছিল 'গান'। সমবেত কণ্ঠে নর-নারী গেয়ে উঠেছেন গর্জে ওঠার গান। 'বিপ্লবেরই রক্তে রাঙা, ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য', 'মার্কিনি লাল ইয়াং কিরা চায় কি হে রক্ত হে', 'জোঁকগুলো সব রক্ত চাটা', 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা', 'আমরা পেয়েছি রক্ত দীপের নিশানা' প্রভৃতি প্রলয়ংকরী বাণীসমৃদ্ধ গান।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও অভ্যুত্থানে নারীসমাজ ও ছাত্রীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রীদের ওপর সামরিক জান্তার সশস্ত্র পুলিশ লাঠিপেটা করে। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আসাদুজ্জামান, সে খবর জেনে শিবপুর গ্রামের বাড়ি থেকে আসাদের মা ছাত্রজনতাদের কাছে বাণী পাঠালেন,

> "আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত, 'মা, আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে।' আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো।' (দৈনিক আজাদ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০)। এভাবেই আসাদের মা হয়ে ওঠেন মুক্তিযোদ্ধা।"[৮]

এ প্রসঙ্গে আবদুল লতিফের কথা ও সুরের একটি গান-

'আবার জেগেছে সেই ছাত্রসমাজ
সাথে তার অগণিত জনতা
মুখে মুখে ধ্বনি আজ সবাকার
এক জাতি এক প্রাণ একতা॥
এদেশের প্রতিটি আন্দোলনে
সেই কথা জানা আছে বিশ্বজনে
এদেশের তরুণেরা বারবার
গড়ে ইতিহাস রূপকথা॥
বাহান্ন সনে তাজা রক্ত ঢেলে
মায়ের ভাষার মান রাখলো
বাষট্টি সনে রাশ বহ্নি জ্বেলে
শিক্ষা কমিশন রুখলো॥
ঊনসত্তরে ওরা বাঁধনহারা
ভেঙেছিলো কারফিউ পাগলপারা
মুক্তিযুদ্ধে জয়ী একাত্তরে
ওরাইতো আনে স্বাধীনতা। ...'

১৯৬৯ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীসমাজ রাজবন্দি মুক্তি আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং মিছিলে যোগ দিয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আড়াই হাজার মহিলা সমাবেশ করে মিছিলে অগ্রসর হন। এমনকি বোরকা পরে তারা মিছিলে শামিল হতেন। ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। ২৩ মার্চ ব্যাপক নারী মিলিত হয়ে সন্ধ্যায় মিছিলে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বানে নারীরা গুরুত্বসহকারেই সাড়া দিয়ে দেশের সব জেলায়, শহরে, এলাকায়, গ্রামে সংগঠিত হন। ট্রেনিং এবং কুচকাওয়াজ শুরু করেন। ৯ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে কালো পতাকা তোলার কর্মসূচি এবং ৯ মার্চ হরতাল পালিত হয়। এ কাজে নারীসমাজ এবং ছাত্রীসমাজ প্রধান ভূমিকা রাখে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহসহ সব জেলায় নারীসমাজের প্রতিবাদী সভা ও মিছিল হয়েছিল। তাই বলা যায়, আসলে–

> 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে সারা বিশ্বের দেশে দেশে আমাদের সাহায্যার্থে কত মানুষ কতকিছু করেছেন কর্তব্যবোধে, কতকিছু ঘটেছে, তার কতটুকু জানি আমরা!'

তেমনি আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে কত নারী নিভৃতে কী কী করে গেছেন, তা-ও কি ভালো করে জানতে পেরেছি আমরা? ধরা যাক সিলেটের কথাই– ১৯৪৭ সালের ৬/৭ মে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নারীকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সিলেট বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে 'মাহে নও' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (মে, ১৯৫৯) 'তসলীমা' নামের একটি গল্প রয়েছে'[৯]। এতে নারীসমাজের অবদান বিশেষভাবে উঠে এসেছে। বিশেষত কেন্দ্রীয় চরিত্র তসলীমা, দেশের কাজে আত্মত্যাগে একটা চোখ হারান এবং নিজের একান্ত-পছন্দের বিয়ে ভেঙে দেন। তার শ্বশুর অক্লান্ত রাজনৈতিককর্মী তসলীমাকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজি হননি। এ গল্পে তার প্রণয়ী নাজামের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটার বেদনাময় চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পটি সে সময়কার বাস্তবতার দলিলস্বরূপ। আসলে একসময় সিলেট ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। অনেক বড়ো বড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে সেখান থেকে। সবচেয়ে বড়ো কথা, সব আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বীরবিক্রমে অংশ নিয়েছেন। এখানে রয়েছেন নারীনেত্রী লীলা নাগ, বিপ্লবী নেত্রী হাজেরা মাহমুদ, ষোড়শী চক্রবর্তী, নারীনেত্রী বিলঙ্গময়ী কর, হোসনে আরা, আনোয়ারা বাসিত প্রমুখ।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের সংগ্রামী ভূমিকা' নিয়ে প্রকাশিত বইয়ে হাজার হাজার নারীর নাম এসেছে। রাজনৈতিক দলের কর্মী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, সংসদ সদস্য, নারীনেত্রী, গবেষক, লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রী প্রমুখ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষিত নারীরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এ যেমন সত্য আবার মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন স্বাধীনতার ২৮ বছর পর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়েছেন এ-ও সত্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার ও রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নারীদের শুধু অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যুদ্ধে যেতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল না। কলকাতায় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় গোবরা ক্যাম্পে ৩০০ জন তরুণীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার ও রাজনৈতিক দলের এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। কারণ,

> 'মুক্তিযোদ্ধাদের জবানিতে লেখা বহু দলিলে-বইয়ে জানা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাইল, খুলনাসহ দেশের নানা অঞ্চলে নারীরা গেরিলা যোদ্ধাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন। নারীদের সাহায্য ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত যে মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও ছিলেন গেরিলা যোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা।'[১০]

ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজ করেছেন নারীরা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পের রাঁধুনিরা অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করা, সরকারি ও প্রশাসনিক কাজ করা, প্রচার করা, ট্রেনিং দেওয়া-নেওয়া করেছেন। তারা শত্রুদের বিষয়ে, খানসেনা-রাজাকারদের অবস্থান বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর দেওয়া, চাঁদা তোলা, ওষুধ-খাবার-কাপড় সংগ্রহ করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, প্রতিরোধ করা, যুদ্ধ করা, মনোবল তৈরি করা, বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া, যোদ্ধাদের রেঁধে খাওয়ানো, পরিজনদের সামলানো, সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে দেশের ভেতরে-বাইরে, শহর-গ্রামে, প্রবাস-ভারতসহ সবস্থানে লাখ লাখ নারী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রয়াত সভানেত্রী সুফিয়া কামাল এ সময় ৯ মাস ঢাকায় নিজ বাড়িতে, পাকিস্তানি বাহিনীর কড়া নজরদারিতে থেকেও

মুক্তিযোদ্ধাদের নানা কৌশল অবলম্বন করে সহযোগিতা করেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র শিল্পীরা, 'মুক্তির গানে'র শিল্পীরা গানের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে, জাগিয়ে তুলেছিলেন দেশের অভ্যন্তরে পীড়িত, নির্যাতিত, উদ্বিগ্ন, শোকগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সমাজকে। এদেশে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব ধর্মাবলম্বী নারীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শুধু বাঙালি নন, আদিবাসী নারীরাও সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক, তবু কষ্টের সঙ্গে বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধের ২৯ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন এদেশের সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা নারীরা। অথচ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রথমত নারীরই প্রাপ্য। কারণ:
প্রথমত, নারীজাতির সংগ্রাম ছিল স্বদেশ মুক্তির জন্য। এবং
দ্বিতীয়, একাজ তাদের করতে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করে তবেই।

পূর্বের ধারাবিবরণী থেকেও বোঝা যায়, নারী কতভাবে জাতীয় আন্দোলনে সহযোগী, সহযোগিতা বা সহযোদ্ধা হয়েছেন। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সার্বিক গবেষণা প্রয়োজন তা হচ্ছে 'বীরাঙ্গনা নারীদের' প্রসঙ্গ। বঙ্গনারী বলতে, এদেশের মানুষের মনে সতীসাবিত্রীর উপমা ভেসে ওঠে। শত গুণে গুণান্বিতা হয়েও কোনো নারীর যদি বিবাহবহির্ভূত মাত্র একটি কুৎসা রটনা থাকে, তাহলে সে সারা জীবনে, একটা সুস্থ জীবন পায় না। প্রতি পদে 'চরিত্রহীনা' আখ্যাই তাকে পেতে হয় সম্মানের বদলে। স্বামী-সন্তান-পরিবার-পরিজন তার সে দুর্ঘটনাকে কোনোদিন ক্ষমা করে না। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যায় জীবনের হঠাৎ ঘটা বা মিথ্যা রটনার সেই ইতিহাস। এখানে দুটি বিষয়–

১. যুদ্ধবিধ্বস্ত নারীর সম্ভ্রমহানির জন্য নারী তো দায়ী নয়, দায়ী পাকিস্তান হানাদার-বাহিনীর পাশবিকতা।
২. বীরাঙ্গনা নারী যুদ্ধ করেছে তার মনের সঙ্গে, দেহের অত্যাচারের সঙ্গে, লজ্জা-সম্ভ্রমের সঙ্গে, ক্ষুধা-অনাহারের সঙ্গে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার পরিস্থিতির সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে, হতাশার সঙ্গে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবনার সঙ্গে, জীবনের মধুর স্বপ্ন চিরতরে হারানোর সঙ্গে, অন্ধকার ভবিষ্যৎ ভাবনার সঙ্গে, ... তারপরও সে 'বীরাঙ্গনা' নারী, 'বীরযোদ্ধা' নয়। তার নিদারুণ কঠিন যুদ্ধ, শেষ করার পর নিদারুণ অসম্মান কেন, তাকে তো 'শ্রেষ্ঠ বীর' আখ্যা দেওয়া উচিত ছিল? অথচ চিরপরিচিত সমাজ-সংসার তাদের গৃহাভ্যন্তর থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছিল। এত বড় আত্মত্যাগের পরও নিকটাত্মীয় কর্তৃক তারা বর্জিত হয়েছিলেন কেন? যে অন্যায়-কলঙ্ক তার শরীরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার দায় তার মোটেও নেই অথচ এত বড়ো শাস্তি সমাজ-পরিবার কেন তাকেই দিয়ে পাঠিয়েছিল পুনর্বাসন কেন্দ্র বা যম দুয়ারে? তা ফিরে দেখার অবকাশ স্বাধীন দেশের নাগরিকদের তো না-থাকারই কথা! তিন লাখ বা চার লাখ ষাট হাজার মা বোন লাঞ্ছিত হয়েছেন, ত্রিশ লাখ শহিদ হয়েছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তত রাজাকার হিসেবে তো একটি নারীর নামও পাওয়া যায়নি। এ বিষয়েই বৃহৎ পরিসরে গবেষণা প্রয়োজন। প্রয়োজন হবে সমাজের সুধীজনদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর। বিধ্বস্ত হোক নারী যে কোনো পাক-প্রকারে, তাকে তিরস্কার না করে স্নেহের ছায়ায় তার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে হবে। তা হলেই তো সে পারবে দেশ জাগাতে, পরিবার-সমাজ-দেশে শান্তি-সুখ আনতে।

১৯৭১ সালের ২৫ মে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপিত হয় কলকাতার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮নং দ্বিতল বাড়িতে। সেখানেও নারীসমাজের দৃপ্ত পদচারণায় মুখর ছিল। বেগম মুশতারী শফি আগস্টে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' শব্দসৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বলেন,

> 'সেখানে আমার কার্যক্রম ছিল 'বাংলার রণাঙ্গনে নারী' শীর্ষক একটি স্বরচিত কথিকা প্রতি মঙ্গলবার স্বকণ্ঠে পাঠ, প্রতি রোববার 'অগ্নিশিখা' নামক একটি অনুষ্ঠানে অ্যাডভোকেট গাজীউল হক রচিত 'এহিয়াবধ কাব্য' আবৃত্তি, প্রতি শুক্রবার জাহিদ সিদ্দিকী রচিত একটি নাটিকায় অংশগ্রহণ ও নির্ধারিত শিল্পী মাধুরী চ্যাটার্জীর অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে কল্যাণ মিত্র রচিত ধারাবাহিক 'জল্লাদের দরবার' নাটকে অভিনয় করা। এভাবে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত সাল আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।'

এমনকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১ম অধিবেশনেও গৃহবধূ মিসেস টি হোসেন ইংরেজি সংবাদ পাঠ করেন। একক ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী শিল্পীরা হচ্ছেন–

১. সনজীদা খাতুন
২. শেফালী ঘোষ
৩. কল্যাণী ঘোষ
৪. স্বপ্না রায়
৫. নমিতা ঘোষ
৬. মালা খান
৭. রুপা খান
৮. মাধুরী আচার্য
৯. রমা ভৌমিক
১০. ডালিয়া নওশীন
১১. শাহীন সামাদ
১২. লায়লা হাসান
১৩. উমা ইসলাম
১৪. নাসরীন আহমেদ শিলু
১৫. মিতালী মুখার্জী
১৬. মঞ্জুলা দাশগুপ্ত
১৭. বুলবুল মহলানবীস
১৮. ঝর্ণা ব্যানার্জী
১৯. আফরোজা মাসুদ
২০. অরুণা সাহা
২১. ফ্লোরা আহমেদ
২২. বুলা মাহমুদ প্রমুখ।[১১]

তবে দেখা যায়, এ সময় গীতিকার ও সুরকার হিসেবে নারীর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' জনজাগরণী মন্ত্রসম গানটির সুর করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলা দেবী। তাছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), কুসুম কুমারী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০), সরোজিনী দেবী, সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫), হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩) প্রমুখ গান লিখেছেন অনেক আগে থেকেই। যেমন–

'তোরা শুনে যা আমার মধুর' –কামিনী রায়
'বন্দি তোমায় ভারত জননী' –সরলা দেবী
'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি' –সরলা দেবী
'আজ এস সবে গীতরবে' –ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
'কোন রূপসাগরে ডুব দিলি' –সরলা দেবী
'জয় যুগ আলোকময়' –ঐ
'নমো নমো জগত-জননী' –ঐ
'বালাই নিয়ে মরি তোদের' –ঐ
'মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠরুদ্ধ' –ঐ
'রণ রঙ্গিনী নাচে, নাচে রে' –ঐ
'স্বাগত! স্বাগত! স্বাগত! –ঐ
'ও চরণ বন্দি প্রণমি হে গান্ধি' –সরোজিনী দেবী
'কি ভাবিছ সব, ভারত গৌরব' –ঐ
'নিক না মোদের জেলে ধরে' –ঐ
'মা তোমারি তরে এসেছি' –ঐ
'বন্দেমাতরম বলে আয়রে' –স্বর্ণকুমারী দেবী
'লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে' –ঐ
'শতকণ্ঠে কর গান জননীর' –ঐ
'ওহে বিশ্বশোভন মুক্তচেতন' –হেমলতা ঠাকুর। প্রভৃতি গান।

তারপরও স্বরলিপিকার, গীতিকার, সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন যারা:

জলি বাগচী (স্বরলিপিকার): জাগো জাগো জাগো সর্বহারা (কথা: ইউজেন পোতিয়ের), ও হোসেন ভাই দামুকদিয়ার চাচা (কথা ও সুর: বিজন ভট্টাচার্য), আমাদের যেতে হবে (কথা: চেরাবাণ্ডারাজু)।

সঙ্গীতা দাশগুপ্ত (স্বরলিপিকার): ওরা জীবনের গান গাইতে দেয় না (কথা ও সুর: হেমাঙ্গ বিশ্বাস), ধিতাং ধিতাং বলে (কথা ও সুর: সলিল

চৌধুরী), ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন (কথা ও সুর: সুধীন দাশগুপ্ত), বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের (কথা ও সুর: ভুপেন হাজারিকা), গঙ্গা আমার মা (কথা ও সুর: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

দেবীদাস তরফদার (গীতিকার ও সুরকার): মুখটি তোল মাগো আমার। গানটি ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উপলক্ষে ২০০০ সালে রচিত।

জয়ন্তী দত্ত (গীতিকার): মেঘ জমেছে আকাশ কোণে। গানটি ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে রচিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিককর্মী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী সংস্থা' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। জড়ো হয়েছিলেন সেখানে শিল্পী, লেখক, চিত্রকর, নাট্যশিল্পী বিভিন্ন মেধার মানুষ। তাদের কাজ ছিল শরণার্থী শিবির ও মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন মুক্তিফৌজ ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দেশপ্রেরণামূলক গান গেয়ে, পুতুলনাচভিত্তিক নাটক দেখিয়ে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতে আশ্রিত লাখ লাখ মানুষ এবং বন্দুক কাঁধে আগুয়ান মুক্তিদ্ধোদের এসব জনসংগীত বা প্রেরণামূলক দেশাত্মবোধক গান, গণনাটক অনুপ্রাণিত করত দেশমাতাকে স্বাধীন করার শপথে। জীবন বাজি রেখে এসব সাংস্কৃতিককর্মী প্রতিদিন বেদনাহত মানুষের কাছে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন আশার বাণী। হারমোনিয়মসহ গানের সরঞ্জাম, বাংলাদেশের পতাকা হাতে তারা ছুটে চলেছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে নিরলসভাবে আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে জনচিত্তের চেতনায় যুদ্ধের প্রেরণা জাগাতে এবং অটুট রাখতে। তাদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদুর রহমান বেণু, তারিখ আলী, স্বপন চৌধুরী, বিপুল ভট্টাচার্য, দুলাল চন্দ্র শীল, দেবব্রত চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার (অব.) গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী বীরবিক্রম, আমিনুল হক বাদশা এবং নাম না-জানা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। আর নারীদের মধ্যে ছিলেন শাহীন সামাদ, নায়লা খান, লুবনা মারিয়াম, শারমিন মুরশিদ, লতা চৌধুরী প্রমুখ। এ দুঃসাহসী কাজেও নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সাংস্কৃতিককর্মীদের এ দলটির প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও তৎপরতার দৃশ্য সেলুলয়েডে ধরে রাখেন একজন মার্কিন চলচ্চিত্রকার– লিয়ার লেভিন ও তার দল। তারা এই স্মরণযোগ্য কাজটি করেন। এখানে মুক্তিযুদ্ধের ১১টি গান ও 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' সদস্যদের সাক্ষাৎকার ধারণ করেন তিনি। গানগুলো হচ্ছে–

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
নগরে প্রান্তরে বনে বনে। অশ্রু ঝরে দুনয়নে।'
২. মোশাদ আলী– 'এই না বাংলাদেশের গান গাইতে গেলে
দয়াল দুঃখে আমার পরাণ কান্দেরে।'
৩. মোশাদ আলী – 'কৃষক মজুর বাংলার সাথীরে
ও ভাই মোর তোমার কিসের ভয়,
তোমার হাতে দেশের কাঠি
হবে রে হবে রে জয়।'
৪. মোশাদ আলী– 'পাক পশুদের মারতে হবে
চলরে নাও বাইয়া।
নৌকা এবার চলে এবার যুদ্ধের সামনে লইয়া
হেইয়ারে।'
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে।'
৬. দ্বিজেন্দ্রলাল– 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা।'
৭. মোশাদ আলী– 'বল বলরে বল সবে বলরে বাঙালির জয়।'
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– 'আমার সোনার বাংলা'
৯. সিকান্দার আবু জাফর– 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'
১০. জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র– 'যশোর খুলনা বগুড়া পাবনা ঢাকা বরিশাল
নোয়াখালী তারা হিন্দুও নয় মুসলিম নয়
তারা শুধু বাঙালি।'
১১. গুরুসদয় দত্ত– 'বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণদল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল
সূর্যসেন তিতুমীরের বীর্য গরিমা
লালন শা নজরুলের ছন্দ ভঙ্গিমা।'

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের লেখা একটি গান–
'ও আমি দেশের লাগিয়া পরদেশি হইলাম
পাঞ্জাবিরও জুলুম এত কাল সইনু
কিন্তু এবার বাংলা পাক পালাইবে ভীষণ ঝাইড়া
সঙ্গে পালায় সপ্তম বহর।...
কিন্তু এবার মুলুক ছাইড়া মগ পালাইবে বিষম ঝাইড়া
সঙ্গে পালায় আল বদর
ফিরবো এবার ঢাকা শহর।
নিয়াজ সাব কান্দিয়া কয়
আমায় দাও ...'

এ অধ্যায়ের উপসংহার টানা হলো প্রখ্যাত অধ্যাপক, সংগীতশিল্পী, নারীনেত্রী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব– সনজীদা খাতুনের একটি আত্মজিজ্ঞাসা আর নিজেই তার উত্তর দেওয়ার মধ্য দিয়ে। সনজীদা খাতুন এদেশে ১৯৪৭ সালের পর থেকে 'ভাষা আন্দোলন' তারপর '৭১-র মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থানে থেকে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে গেছেন আন্তরিকভাবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে তো বটেই, এদেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি রক্ষায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। 'ছায়ানট'র প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ওয়াহিদুল হক তার সম্পর্কে বলেছেন–

> 'বুলবুল একাডেমির কাজে পাকিস্তানি জগদ্দলটি নরম করা গিয়েছিল মাত্র। তা ভেঙে ধস নামল ছায়ানট প্রতিষ্ঠার পরে। রবীন্দ্রশতবর্ষ অনুষ্ঠানমালার প্রভাবকে এগিয়ে নিয়ে যায় ছায়ানট। একেবারে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। একাত্তরের ২৩ মার্চ শহিদ মিনারে তারা 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গেয়ে গানে ও কথায় প্রত্যয় শপথে স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘোষণা দেয়। রবীন্দ্রসংগীতের ভিত্তিতে গ্রন্থিত তাদের ঋতু-উৎসবগুলো বিশেষত রমনা বটমূলে তাদের বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠান সরাসরি পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক আরোপকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পর্যুদস্ত করে। এবং এই পর্যায়ের এই 'রাষ্ট্রদ্রোহী সাংস্কৃতিক বিস্ফোরণের অবিসংবাদী নেত্রী সনজীদা খাতুন।'[১২]

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালির আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি গভীর চিন্তায় ফেলে পাকিস্তানি শাসকদের। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল খুঁজে পেল আর তা হচ্ছে– 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। এই মূলোচ্ছেদন বা উৎপাটনে তারা তৎপর হতেই গর্জে উঠল বাঙালি জাতি একত্রিত হয়ে সমস্বরে। কারণ আমাদের জাতীয়তা-সংস্কৃতি-রবীন্দ্রনাথ যে এক ও অভিন্ন। তাই মনীষীরা বলেন–

> 'পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান মানে যেমন সংস্কৃতিতে ফেরা, জাতীয়তায় ফেরা, স্বাধীনতায় ফেরা, তেমনি রবীন্দ্রনাথেও ফেরা। এবং এই ঘরে ফিরবার, কাননে ফিরবার, প্রধান দিশারিও বটে রবীন্দ্রনাথ নিজেই।'[১৩]

সেজন্য ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন তৎকালে ছিল বাঙালি সংস্কৃতির জীবনমরণের চ্যালেঞ্জ। মহাসমারোহের সঙ্গে পালিত হয়েছিল উৎসব। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক সংগঠনের শপথে জন্ম হয়েছিল 'ছায়ানটে'র। এ প্রসঙ্গে সনজীদা খাতুনের বক্তব্য,

> 'সুফিয়া কামালকে দমন করা যায়নি। সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়েছিল উৎসব। ফলে তখনই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে এদেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনের শপথ নিয়েছিল সেদিন, জন্ম হয়েছিল ছায়ানটের।'

'ছায়ানট' বুঝেছিল ঐতিহ্য-সংস্কৃতি একটা জাতির প্রাণ আর প্রাণশক্তি। 'ছায়ানট' ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে ধরে ধরে এগিয়ে গিয়েছে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে সব বাঙালি জাতিকে সঙ্গে করে। আজ আমরা স্বাধীন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তির জন্য নয়; বাঙালি যুদ্ধ করেছিল তার প্রাণের (গান) মুক্তির জন্য, সংস্কৃতি-ভাষার মুক্তির জন্য, বুদ্ধি-জ্ঞানের মুক্তচিন্তা করার জন্য। তাই আমাদের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের সব দেশের চেয়ে আলাদা অর্থময়, আলাদা অনুভবের। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– গাইতে গাইতে বাঙালি জাতি হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হতো মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ভালোবাসতেন, শুধু তা-ই নয়, তিনি এ গানটি অন্যকে শোনাতে এবং জানাতে চাইতেন। সনজীদা খাতুন স্মৃতিচারণে লিখেছেন:

> 'সাংসদদের সম্মানে কার্জন হলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য ডাক পড়েছিল আমার। সেখানে অনুরোধ এল 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন সাংসদ। তিনি চান পশ্চিম পাকিস্তানের সাংসদদের কাছে আমাদের 'সোনার বাংলা' প্রীতির জানান দিতে। ... যতদূর মনে পড়ে প্রথম দুটি স্তবকই শুধু গাইতে পেরেছিলাম সেদিন। সেটুকুতেই উদ্দেশ্য সাধন হয়েছিল। ... প্রথম দুই স্তবকই তো আজও আমাদের পরম প্রিয় ঘোষণা বলে জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে।'[১৪]

বঙ্গবন্ধুও রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে প্রেরণা নিতেন, শুনতেন আর নিজেই গুণগুণ করে গাইতেন। তাই ওয়াহিদুল হক যখন বলেন,

> 'একাত্তরের সমস্ত দেশে উন্মাদনা, মুক্তির প্রথম উজ্জীবক স্পর্শ জনচিত্তে। 'আমার সোনার বাংলা'র পাশাপাশি এসে গিয়ে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' এসেছে 'হবে জয় হবে জয়'। অনুষ্ঠান বেড়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অহোরাত্র গুণগুণ গাইছেন 'বারে বারে হেলিসনে ভাই।' 'ততই বাঁধন টুটবে।' স্নেহের খনি আবুল খয়েরকে ঠেলে বার করে দিচ্ছেন নতুন গানের জন্যে। খয়ের নিয়ে যাচ্ছেন ছায়ানট থেকে রেকর্ড করে।'[১৫]

তাতে বঙ্গবন্ধুর মনের অবস্থা, দেশের মানুষের চিত্তের ঠিকানা প্রকাশ পায় বৈকি! কাজেই 'আমার সোনার বাংলা' আমাদের জাতীয়তাবোধের মূলশক্তি হলেও অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীতও যে জনচিত্তে প্রবল উন্মাদনার জোয়ার এনেছিল, তা ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই রবীন্দ্রসংগীত তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির অমোঘ টানে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। সনজীদা খাতুন তখনই নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। 'সংগীতশিল্পী কি মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন?' তিনি একটি প্রবন্ধে নিজের এই প্রশ্নের উত্তরও দিলেন।

প্রথমেই বললেন, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী মুক্তিযোদ্ধা, কারণ তাদের কণ্ঠের গান ভারতবাসীকে শুধু নয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আগত বহু বিশ্ববাসীকে বাঙালির দুর্দশার দিনে বেদনাহত করেছিল। শরণার্থী শিবিরের দুস্থ মানুষকে, মুক্তিযোদ্ধা শিবিরের মানুষকে এসব গান মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাই রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তার মতে, 'যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চারণ করাও যুদ্ধের অঙ্গ।'[১৬] এরপর বললেন, গীতিকারগণও মুক্তিযোদ্ধা, কারণ গান লেখার দরকারি কাজটা তিনি করেছেন। আবার অপরাপর গানের শিল্পীগণও (যারা সচরাচর রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন না) তো মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কাজ করলেন; যারা নজরুল, শেখ লুতফর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবু বকর সিদ্দিকের গান বা আরও কত গীতিকারের গান গাইলেন; তারাও তো মুক্তিযোদ্ধা। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সব গানের শিল্পীই মুক্তিযোদ্ধার আসন পেলেন। তবে তার মতে, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। কারণ, বাঙালির মুক্তির গানগুলো ১৯৫২ সালে জাগে নানা সুরে। শেখ লুতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর সে সময়ের প্রয়োজনে গান লিখলেও রবীন্দ্রনাথ তার অনেক আগেই লিখে গিয়েছেন– 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।/ কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ পরে।/ সে যে আমার জননী রে।/ কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।/ কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়।/ সে যে আমার জননীরে॥' তবু এ গান ঠিকই প্রয়োজনে সঠিক ভাব-ভাষা জুগিয়ে গিয়েছে। এরপর প্রবন্ধের শেষে জানালেন–

> 'আমরা সকল শিল্পী সকল গীতিকারই মুক্তিযুদ্ধে সহযোদ্ধা। সে যাত্রায় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী, নজরুলগীতিশিল্পী, গণসংগীতশিল্পী, লোকগীতিশিল্পী সকলেই মুক্তিসংগ্রামী। মুক্তির গান রচয়িতারাও সেই সংগ্রামে আমাদের সাথী।'

সনজীদা খাতুন একজন প্রকৃত নারীর উদাহারণ এ প্রসঙ্গের আলোচনায়। তিনি তার ছাত্রজীবন থেকে বর্তমান জীবন পরিক্রমায় নানা ক্ষেত্রে নানা অবদান রেখেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামে ছুটে গিয়েছেন। নারীদের সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছেন। ছায়ানটে গান শিখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান গড়েছেন জাতীয়তাবোধের চেতনায়। বাঙালির ঐতিহ্যকে, সংস্কৃতিকে শক্ত ভিত্তি দিতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার তৎপরতা অব্যাহত ছিল সাংস্কৃতিককর্মী, শব্দসৈনিক হিসেবে, নেত্রী হিসেবে। তিনি নিজেই 'একটি প্রতিষ্ঠানের নাম'। এই মহিমাময় নারীর মতো অগণিত নারী আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশের বিপৎসংকুল সময়ে কখনো পেছন থেকে প্রেরণা-সাহস জুগিয়েছেন। আবার কখনো বিপদ মোকাবিলায় রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন। নারীর প্রেরণাই পুরুষের অস্ত্র ধরার সাহস, যুদ্ধ করার মনোবল। বাংলার নারীসমাজ জেগেছিল বলেই এদেশের স্বাধীনতা এসেছে খুব স্বল্পসময়ে। নারীরা একদিকে মুক্তিযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, শরীরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন সরাসরি। শেখ মুজিবুরের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বানে দেশের সব জেলায়, শহরে, এলাকায় নারীরা সংগঠিত হয়ে কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র ট্রেনিং নিতে শুরু করেছিলেন। গৃহকোণে থেকেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, নানা কাজে অবদান রাখেন আবার সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও জাতির মনোবল অটুটু রাখতে অনুষ্ঠানে-আন্দোলনে-স্লোগানে উপস্থিত থেকে যথাযথ কাজ করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়– যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক নারী সম্মান হারানোর ভয়ে এখনো নিভৃতে, বিদেশে আত্মগোপন করে বা অসহায়ভাবেই জীবনাবসান করেছেন। তাদেরই বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মান দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল জাতির একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সবভাবেই–

১. তাদের শনাক্ত করে আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা।
২. নিজস্ব বাসভবন, চাকরির ব্যবস্থা করা।
৩. তাদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য জনগণের ভ্রান্তধারণা পাল্টাতে প্রত্যেক মিডিয়ায় (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক) নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. দেশব্যাপী জনমত তৈরির জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
৫. পাঠ্যপুস্তকে 'মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান' বিশেষত বীরাঙ্গনা নারীদের ইতিহাস শ্রেণি উপযোগীভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।

নারী সম্ভ্রমের প্রতীক। নীতিশাস্ত্রে নারীর মর্যাদা সবার ওপরে। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী জাগলেই দেশ জাগে। বিশেষত সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে সহায়ক হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সবসময় একসঙ্গে হাত ধরে চলেছে। এদেশের মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে সংগীত। সে সংগীতে পুরুষের পাশাপাশি নারী ছিল চিরকাল, আছে এবং থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা.), বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাস ও তত্ত্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা 'কিছু স্মৃতি', শেখ হাসিনা, পৃ. ৯১-৯২
২. সেলিম রেজা (সম্পা.), মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, 'নারীর মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারী', মালেকা বেগম, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৩৫
৩. ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৪. সেলিম রেজা (সম্পা.), পূর্বোক্ত, 'গণমানুষের কাছেই আমার রাজনীতির হাতে খড়ি', আবদুল মতিন (ভাষাসৈনিক), পৃ. ২৯
৫. সনজীদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা ভাষা আন্দোলন: নববর্ষ: ছায়ানট: মুক্তিযুদ্ধ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা 'একুশের সুখ-দুঃখ', পৃ. ৩৭
৬. পূর্বোক্ত, 'আমাদের সংগীত সংস্কৃতির আন্দোলন', পৃ. ১৪৪-১৪৫
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৮. সেলিম রেজা, পূর্বোক্ত, 'মালেকা বেগম', পৃ. ১৩৩
৯. ড. শিল্পী ভদ্র, "'মাহে নও' পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতার রূপ", শব্দকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৯-২১
১০. সেলিম রেজা (সম্পা.), পূর্বোক্ত, 'মালেকা বেগম', পৃ. ১৩৫
১১. সাইম রানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭
১২. সেলিম রেজা (সম্পা.), পূর্বোক্ত, 'স্বদেশ সাধনা' ওয়াহিদুল হক, পৃ. ৩৮-৩৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
১৪. সনজীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, 'সংগীতশিল্পী কি মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে?', পৃ.১৩৯
১৫. সেলিম রেজা (সম্পা.), পূর্বোক্ত, ওয়াহিদুল হক, পৃ. ৩৯
১৬. সনজীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

লেখক: গবেষক

নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

ইরানী বিশ্বাস

দৈনন্দিন জীবনে বিনোদনের একটি বড়ো মাধ্যম নাটক। অতীতের কথা থেকে জানা যায়, সমাজের প্রগতিশীল মানুষ সাহিত্য ও নাট্যচর্চা করতেন। জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্য বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হলে উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি প্রাচীন বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। সে সময় গ্রামীণ সংস্কৃতির আদলে সংস্কৃত নাটকের চর্চা শুরু হয়। পাল শাসনামলে বিক্রমপুর বিহার নাট্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সেন শাসনামলে এ ধারা অব্যাহত থাকলেও মুসলমান শাসনামলে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সংস্কৃত নাটক থেকে বাংলাদেশি মঞ্চনাটক উৎপত্তি লাভ করে। গুপ্ত বংশ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলা সংস্কৃতিতে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং নাট্যচর্চার প্রসার ঘটে। পরবর্তী সময়ে আদি বাংলা পল্লি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে বাংলা মঞ্চনাটকে নিজস্ব ধারা সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে মঞ্চনাটক সত্যিকার অর্থে বিকাশ লাভ করে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন নতুন মঞ্চনাটক আন্দোলনের জন্ম দেয়। 'এম এল সোনার বাংলা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রথম মঞ্চস্থ নাটক। এটি একটি প্রতীকধর্মী নাটক, যার রচয়িতা ছিলেন শহীদুল আমীন। এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন মুহাম্মদ নুরুল কাদির এবং পরিচালক ছিলেন আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ছিলেন– খলিল, বুলবুল আহমেদ, মেহফুজ, ফিরোজ ইফতেখার, কৃষ্ণা কাবেরী, জাফর আহমদ, জিয়াউল হুদা উজ্জ্বল, হাবিবুর বাসার, আবুল হুসেন প্রমুখ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মঞ্চনাটকের মধ্যে রয়েছে– পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), যুদ্ধ এবং যুদ্ধ (১৯৮৬)– সৈয়দ শামসুল হক, একাত্তরের পালা (১৯৯৩)– নাসির উদ্দিন ইউসুফ, বিবিসাব (১৯৯৪)– আবদুল্লাহ আল মামুন, জয়জয়ন্তী (১৯৯৫)– মামুনুর রশীদ, বদল– মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

বর্তমান সময়ে মঞ্চে তেমন উল্লেখ করার মতো মুক্তিযুদ্ধের নাটক চোখে পড়ে না। তবে নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনসাম্বল প্রযোজিত, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত এবং মঞ্চসারথি আতাউর রহমান নির্দেশিত 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মঞ্চনাটক খুব সাড়া ফেলেছিল। মান্নান হীরা রচিত ও সুদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একক নাটক 'লাল জমিন' দর্শকমনে ভীষণ আলোড়ন ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

সময়ের বিবর্তনে মঞ্চ বিনোদন যান্ত্রিক বিনোদনে পরিণত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের উদ্যোগে পাকিস্তানে টেলিভিশন আনা হয়। তিনি ২৬ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে প্রথম টেলিভিশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় টেলিভিশন সেন্টারটি করা হয় বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ঢাকায় ডিআইটি (বর্তমান রাজউক) ভবনে। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশনের ঢাকা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। টেলিভিশনে প্রথম প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রথম গান গেয়েছিলেন ফেরদৌসী রহমান, প্রথম প্রযোজক ছিলেন মুস্তফা মনোয়ার, জামান আলী খান ও মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান বিভাগের প্রথম ব্যবস্থাপক ছিলেন কলিম শরাফী। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম নাটক ছিল 'একতলা দোতলা'। এটি ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে প্রচারিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং এর রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয়। ১৯৭৫ সালে ডিআইটি ভবন ছেড়ে রামপুরায় টেলিভিশনের নিজস্ব ভবন তৈরি করা হয়। এখন সেটি রামপুরা টেলিভিশন সেন্টার নামে পরিচিত।

'এম এল সোনার বাংলা' নাটকটি ২৮ মার্চ টেলিভিশনে প্রচারের জন্য লেখা হয়েছিল। তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। সময়টি ছিল বিক্ষোভে উত্তাল। ১৯৭১ সালে ১৬ মার্চ নাটকটি রচনা করেছিলেন আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম। ২৫ মার্চ বিকালে নাটকটির চূড়ান্ত মহড়া ডিআইটি ভবনের নিচ তলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরদিন নাটকটির রেকর্ডিং হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল। মহড়া শেষে সবাইকে ২৬শে মার্চ সকাল ১০টায় টেলিভিশন স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। নাটকটির রচয়িতা ও প্রযোজক আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম তার কাছে রক্ষিত নাটকের পাণ্ডুলিপি ২৭ মার্চ ডিআইটি টেলিভিশন ভবনের নথিপত্রের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন, পরে আর সেটি কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে টেলিভিশন ও মঞ্চাভিনেতা সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ রসুলের কাছে এক কপি পাণ্ডুলিপি ছিল, যা তিনি নষ্ট না করে সযত্নে সংরক্ষণ রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীণ হওয়ার পর এই পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই নাটকটি মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৭১ সালে শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস 'সংশপ্তক' থেকে ধারাবাহিক নাটক সংশপ্তক নির্মাণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু চার পর্ব প্রচারের পর সেই বছর মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় এর নির্মাণ ও প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৮৮ সালে আবার এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু একই বছর ভয়াবহ বন্যা হওয়ায় আবার বন্ধ হয়ে যায়। বন্যা শেষে আবার নাটকের নির্মাণকাজ শুরু হয়। উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দেন কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। প্রথম কয়েক পর্বের পরিচালক ছিলেন যৌথভাবে আবদুল্লাহ আল মামুন এবং আল মনসুর। শেষের দিকের পর্বগুলো নির্মাণ করেন মোহাম্মদ আবু তাহের। আবহসংগীত পরিচালনা করেন আনিসুর রহমান তনু।

বিষয়ভিত্তিক নাটকের প্রচলন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তবে অন্য সব বিষয়ের চেয়ে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ দেশের স্বাধীনতা বা বিজয় অর্জন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৯ মাসের এ যুদ্ধকে তাই বিভিন্ন গল্পের ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করাটা নৈতিক দায়িত্ব। আর সেই দায়বোধ থেকেই টেলিভিশনেও উপস্থাপিত হয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। বরাবরই আমাদের টিভি নাটকে মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের কাহিনি উঠে এসেছে আবেগঘনভাবে। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয় প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'বাংলা আমার বাংলা'। নাটকটি লিখেছিলেন ড. ইনামুল হক, প্রযোজনা করেছিলেন আবদুল্লাহ আল মামুন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বাংলা আমার বাংলা' নাটকটি লেখা ও নির্মাণ প্রসঙ্গে ড. ইনামুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে বিটিভির প্রযোজক আবদুল্লাহ আল মামুন একদিন আমাকে বলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাটক লিখতে। পরবর্তী সময়ে ১০ জানুয়ারি নাটকটি লাইভ প্রচারিত হবে। সে অনুযায়ী শিল্পী-কলাকুশলী মহড়া শেষ করে প্রস্তুত। তবে দিনটা ছিল ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিউজ প্রচারিত হচ্ছে। তখন নাটকটি লাইভ থেকে বিরতি নেওয়া হয়। আবার নিউজ শেষে নাটক শুরু হয়। সময়টা সত্যি ঐতিহাসিক ছিল। এ নাটকটি পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়। শুধু তা-ই নয়, এ নাটকটিসহ পরবর্তী সময়ে আমার আরও চারটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

একসময়ে মুক্তিযুদ্ধসমৃদ্ধ মঞ্চনাটক আধিক্য হলেও বর্তমানে সেখানে ভাটা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে নাট্যজন ড. ইনামুল হক বলেন, বিষয়টি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অপপ্রচার করেছে। হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে এজন্যই ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। আজ অনেক নাটক দল সৃষ্টি হয়েছে বা সমৃদ্ধশালী অনেক দলও নতুন কোনো মুক্তিযুদ্ধের নাটক মঞ্চে আনেনি। এটা সত্যি খুব পীড়াদায়ক। ২০০৫ সালের পর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল ক্ষমতায় আসার পর টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক, প্রোগ্রাম তৈরিতে উৎসাহিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে। নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

১৯৭২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমজাদ হোসেনের রচনা ও মুস্তাফিজুর রহমানের প্রযোজনায় প্রচারিত হয় আলোচিত মুক্তিযুদ্ধের নাটক 'জনতার কাছে আমি'। মোর্শেদ চৌধুরীর রচনা ও মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর প্রযোজিত 'এরা ছিল এধারে' এ সময়ে উল্লিখিত আরও একটি নাটক। ১৯৭৩ সালে জেসমিন চৌধুরীর লেখা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' নাটকটি প্রযোজনা করেন আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে টিভি নাটকে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে বহুবার। একটা সময়ে এসে দেশের একমাত্র টেলিভিশন বিটিভিতে মুক্তিযুদ্ধের নাটক স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে নির্মিত হতে শুরু করে। আশির দশকের কাছাকাছি সময়ে এসে আরও কিছু চেতনাসমৃদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের নাটক বিটিভিতে প্রচার হয়। এর মধ্যে জিয়া আনসারীর 'কোনো এক কুলসুম', আকিকুল হক চৌধুরীর 'কম্পাস', রাবেয়া খাতুনের 'বাগানের নাম মালানীছড়া', জোবেদ খানের 'একটি ফুলের স্বপ্ন' এবং রাজিয়া মজিদের 'জ্যোৎস্নার শূন্য মাঠ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হাবিবুল হাসানের রচনায় ও আবদুল্লাহ আল মামুনের প্রযোজনায় 'আমার দেশের লাগি' নাটকটি সে সময়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। এছাড়া মমতাজউদ্দীন আহমেদের লেখা মোস্তফা কামাল সৈয়দের প্রযোজনায় 'এই সেই কণ্ঠস্বর' নাটকটি দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে। আবদুল্লাহ আল মামুনের 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' ও 'একটি যুদ্ধ অন্যটি মেয়ে', আসাদুজ্জামান নূরের 'এ মোর অহংকার', রাহাত খানের 'সংঘর্ষ', আল মনসুরের 'শেকল বাঁধা নাও' ও 'নয়ন সমুখে তুমি নাই', আতিকুল হক চৌধুরীর 'যদিও দূরের পথ' ও 'স্বর্ণতোরণ', মামুনুর রশীদের 'খোলা দুয়ার', রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস অবলম্বনে রফিকুল হক রচিত 'ফেরারী সূর্য' উল্লেখযোগ্য।

২০০১ সালে বিটিভিতে প্রচারিত তারিক আনাম খানের 'জরা' নাটকটিও ভালো নাটক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সে সময়ে আবুল হায়াতের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক টেলিফিল্ম 'পিতা' দর্শকের কাছে প্রশংসিত হয়। এটিএন বাংলা সাইদুর রহমান জুয়েলের পরিচালনায় 'কোন সীমানায় মুক্তি' নামের একটি মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক নাটক প্রচার করে।

২০০৮ সালে আলোচিত হয় ফেরদৌস হাসানের নাটক 'দাগ'। ২০১০ সালে তাহের শিপনের 'কক্ষপথের যুদ্ধ' নাটকটি বেশ প্রশংসিত হয়। ২০১৪ সালে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটকগুলোর মধ্যে 'গুডবাই কমান্ডার', পেজ সিক্সটিন. ডায়েরি-৭১ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ২০১৫ ও '১৬ সালে 'সেলিব্রেটি ৭১', 'বীরমাতা', 'অবশিষ্ট বুলেট', 'একাত্তরের দিনগুলি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৭ সালেও নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক টিভি নাটক। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে অনেক চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে অনেক নাটক। তার মধ্যে বিটিভিতে প্রচারিত রেজাউর রহমান ইজাজ রচিত ও মাহফুজা আক্তার প্রযোজিত 'জননী' এবং চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত ইরানী বিশ্বাসের রচনা ও পরিচালনায় 'লাল শার্ট' বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ফরিদুর রেজা সাগরের গল্পে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'স্মৃতির বাড়ি'। এর নাট্যরূপ ও পরিচালনা করেছেন অরুণ চৌধুরী।

পরিশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করতে টিভিনাটক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাই টিভিনাটকে বেশি করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের নাটক নির্মিত না করে সারা বছরই নির্মিত হতে পারে। তাতে বর্তমান প্রজন্মের অন্তরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লেখক: নাট্যকার, নাট্যপরিচালক

স্বদেশি ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কুমিল্লা এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন

শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রক্তঝরা দিনগুলোয় ত্রিপুরা অর্থাৎ আজকের বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাতায়। এছাড়া স্বদেশি আন্দোলনের সময় এবং তারও আগে স্বদেশি পণ্য উৎপাদন করে সমগ্র ভারতবর্ষে পথিকৃতের ভূমিকা পালনকারী দেশসেবক সাধক ডা. মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার 'প্রবাসী' পত্রিকায়। আর যার লেখনীতে সেই সময় ও দিনগুলোর বর্ণনা চমৎকারভাবে উঠে এসেছে তিনি হলেন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী অখিল চন্দ্র নন্দী। ১৯৩১ সালে এই বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে কুমিল্লা শহরে আয়োজিত বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে স্টিমারে চাঁদপুর হয়ে কুমিল্লায় এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ প্রখ্যাত বিপ্লবী ও বিশিষ্ট নেতারা।

বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণকারী, ত্রিশের দশকে ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসংঘের সভাপতি অখিল চন্দ্র নন্দী তাঁর 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ' (প্রথম খণ্ড, প্রকাশক কে বসু, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, ভারত, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৭৬) গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'আমার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতি জয়শ্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ইংরেজ আমলে কী এমন কাজ করেছিলাম যার জন্য সাত বছর আমাকে জেলে থাকতে হয়েছিল?'

অখিল চন্দ্র নন্দী তাঁর স্মৃতিকথায় আরও লিখেছেন, "যে বালিকাদ্বয়ের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে সারা ভারত একদিন চমকে উঠেছিল, ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ– কুমিল্লার জেলাশাসক মি. স্টিভেন্স, সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নি-আখরে লেখা অতুলনীয় দুটি নাম– শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী- উৎকীর্ণ হয়েছে তাম্রপত্রে। ... বিশেষ করে মনে পড়ছে চট্টগ্রাম সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের নায়ক শহিদ সূর্যসেনের কথা, যিনি তার গুপ্ত আবাস থেকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সর্বপ্রথম নারী সৈনিক নিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্য। মনে পড়ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা, যিনি ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুরে নারী-বাহিনী গঠন করার সময় পথিকৃৎ নারী সৈনিকদ্বয় শান্তি-সুনীতির নামোল্লেখ করেছিলেন।

রজতজয়ন্তী বর্ষে অনেক বিপ্লবী বন্ধু আকাশবাণী হতে বেতারে প্রচার করেছেন তাঁদের স্মৃতিকথা, অনুরুদ্ধ হয়ে আমিও বেতার মাধ্যমে শুনিয়েছি কিছু কথা। সংবাদপত্রের পাতায়ও কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

কিন্তু আরও কত কথাই না বলার আছে। সেই অগ্নিঝরা, রক্তঝরা দিনগুলোর কথা। সেইসব সহযোদ্ধাদের কথা–

'লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ়হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতিকার।'

সর্বাগ্রে আজ মনে পড়ে সতীর্থ শহিদ অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা যে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিল ২ জুলাই ১৯৩৪ সালে। মনে পড়ে, আমাদের দলের মহিলা বিভাগের নেত্রী বিপ্লবী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের কথা, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রাণ দিতে ও নিতে যাবার জন্য তার আকুল আগ্রহের কথা। মনে পড়ে মহাপুরুষ ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা, যাকে শ্রী অরবিন্দু বলতেন, 'ভারতের ঋষি তলস্তয়'। মনে পড়ে আশ্চর্য মানুষ উল্লাসকরের কথা, রসিকতা, কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। মনে পড়ে রেবতী বর্মণের কথা, যার অসাধারণ পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করেছিল বাংলার ছাত্র ও যুবকদের। মনে পড়ে আমাদের দলের নেতা ও স্রষ্টা ললিতমোহন বর্মণের কথা।

'অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা
লিখিল আপন নাম,
চেন কি তাহারে ভাই?
জীবন মৃত্যু দুই তরঙ্গ
জুড়ে তাঁরা উদ্দাম
দুইয়েরই বলগা নাই'।

এই সব দেশপ্রেমিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরেছিলাম বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।"

এই নিবন্ধকার কর্তৃক ভারতের আসামে ভ্রমণে গিয়ে কালীকচ্ছের বিখ্যাত নন্দী বংশের উত্তরাধিকার সাধকপ্রবর ডা. মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৌত্রি অধ্যাপিকা মন্দিরা নন্দীর কাছ থেকে পাওয়া এই 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ' গ্রন্থটিই আজকের নিবন্ধের প্রধান উপজীব্য। এই গ্রন্থে আছে, মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী লোকান্তরিত হওয়ার পর তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল, 'দেশবিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক পরোপকারী কর্মী ব্রাহ্মসাধক ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৯ অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২৬০ সনে তাঁহার জন্ম হয়। (অন্য মত ১২৬১ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ)। ... কলিকাতায় অবস্থানকালে যখন স্বদেশীর নামগন্ধও লোকে জানিত না তখন (১৮৭২-৭৬) তিনিই লিখিবার কালি, ছাপাখানার কালি, কাপড়ের কল, দিয়াশলাইয়ের কল নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন।

নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক হিন্দুমেলা স্থাপিত হইলে, তাহাতে তিনি তাঁহার কলে প্রস্তুত একখানা কাপড়, লিখিবার কালি ও দিয়াশলাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কলে প্রস্তুত করার কাপড়খানা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই সামান্য কাপড়খানা মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তুত লিখিবার কালি কলিকাতার বাজারে রায় ব্রাদার্স ইঙ্ক নামে বিক্রয় হইত।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় ৮ বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় গৃহাদি নির্মাণ করিয়া তিনি এক লোহার কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট ছুরি, কাঁচি, চা-গাছ কাটিবার চাকু ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। অর্থাভাবে কারখানা উঠিয়া যাওয়ার পর তিনি যন্ত্রাদি নিজ বাড়িতে আনিয়া কাজ চালাইয়াছিলেন। তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত করিবার কল আবিষ্কার করিয়া দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট দিয়াশলাই প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশের নানান স্থান হইতে এই কল সরবরাহ করিবার অর্ডার আসিলে তিনি তাঁহার লোহার কারখানায় অনেকগুলো দিয়াশলাইয়ের কল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কলের সংবাদ পাইয়া ইহা দেখিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার মিঃ মোনাহান এবং মিঃ বীট্‌সন তাঁহার বাড়িতে আসেন এবং এই কলের প্রশংসা করিয়া ইহা পেটেন্ট করিবার জন্য তাহাকে পরামর্শ দেন।

জুগীদিগকে তিনি সহজে কাপড় বুনিবার প্রণালি শিক্ষা দেন। তাঁহার বাড়িতে সাত আটখানা তাঁতে দেশী কাপড় বুনা হইত। চরকায় সুতাও কাটা হইত। ইহা স্বদেশী যুগের বহু পূর্বের কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মহেন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিবার জন্য ও স্বদেশী প্রচার করিবার জন্য শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বিপীন চন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী নেতাগণ তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্রের তপস্বীজীবন ও তাঁহার কার্যাদি দেখিয়া অরবিন্দবাবু ও বিপিনবাবু অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক ও বঙ্গের তলস্তয় বলিয়া অভিহিত করেন।

গত পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল তিনি দেশী মোটা কাপড় পরিধান করিয়া গিয়াছেন। অন্য কোনো কাপড় পরিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বিরল।'

মহেন্দ্রবাবুর কাপড়ের কল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কাপড়ের কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছু মাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, 'আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।"

> কুমিল্লায় ট্রেন পঁহুছিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং দর্শনাকাঙ্খায় সমস্ত স্টেশন এবং ষ্টেশন হইতে 'অসিত নগর' পর্যন্ত প্রায় এক মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ রাস্তা জনসমুদ্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ট্রেন পঁহুছামাত্র ৫১টি বমের দ্বারা তাঁহাদের আগমন বিজ্ঞাপিত করা হয়

'মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দেশলাইয়ের কল প্রস্তুত করার প্রয়াস সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'স্বদেশে দেশলাই প্রভৃতি কারখানা স্থাপন করার আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। ... অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশলাই তৈরি হইল। আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। আরও একটি সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না।' (ত্রিপুরার কথা, পৃ. ৬৯)।

অখিলচন্দ্র নন্দী লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র নন্দীর চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে প্রথম দেশলাইয়ের কল আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর তৈরি কল নিয়ে কুমিল্লা, বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। আমার দাদা অমূল্যচন্দ্র নন্দী আমাদের বাড়িতে একটি দেশলাইয়ের কল স্থাপন করেছিলেন। ছোটবেলায় এই কুটিরশিল্পে নিজেও অবসর সময়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯২০-২১ সালে কলকাতার একজিবিশনে এই কল প্রদর্শিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

মহেন্দ্রবাবু যে সময় মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন সে সময় ফিরিঙ্গি ছাত্রদেরই প্রাধান্য ছিল। কলেজের সামনের আসনে বসার জন্য মহেন্দ্রবাবুকে প্রায়ই গোরা ছাত্রদের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিন কথা-কাটাকাটির পর মারামারি শুরু হয়ে যায়। তিনি একটি ছাত্রকে মার দিলে ক্লাসের সব ফিরিঙ্গি ছাত্র তাকে তাড়া করে গোলদিঘীতে নিয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য মহেন্দ্রবাবু জলে নামতে বাধ্য হন। একা একটি ছেলেকে

এতগুলো ফিরিঙ্গি ছেলে আক্রমণ করছে দেখে কয়েকজন গোরা মহিলা 'শেম' শেম' চীৎকার করে উঠে, তখন ঐ ছেলেগুলো লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যায়। মহেন্দ্রবাবুর মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে দেবার এটাও একটা কারণ বলে গুজব শোনা যায়।

তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিজের গৃহে কলকারখানা নির্মাণে ব্যয় করতেন। যখনি আমরা সেখানে যেতাম তখনি গভীর আগ্রহ ও উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ করতাম যে, কোনো না কোনো কল বা কাজ চলছে। কুটিরশিল্প গড়ে তোলার নীতিতে তিনি কর্মে রত ছিলেন এবং নিজের কয়েকটি সন্তানকে এই কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন।

নিজের প্রতিভাবলে তিনি চিকিৎসক হিসাবে, বিজ্ঞানী হিসাবে, দেশপ্রেমিক হিসাবে, সাধক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। লোকে তাকে ক্ষণজন্মা বলিত।

মহেন্দ্র নন্দীর বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। তিনিই ছিলেন তার প্রধান হোতা। তিনি ছিলেন আলিপুর বোমার মামলা খ্যাত অশোক নন্দীর পিতা ও উল্লাসর দত্তের মামা।'

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অখিলচন্দ্র নন্দী এ নন্দীবংশেরই সন্তান। তাঁর ভাষায়, 'স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যাকালে পূর্ববাংলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে আমার জন্ম, ১৯০৮ সালের ৭ মার্চ। ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে কুমিল্লা) কালীকচ্ছ গ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র নন্দী আমার পিতা, মাতা চন্দ্রকুমারী নন্দী। গ্রামের সচ্ছল পরিবারে পুত্র সন্তানের জন্ম খুব সম্ভব শঙ্খধ্বনি দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। আমার জন্মলগ্নে জানি না গ্রহলগ্নের কী অবস্থান ছিল, কিন্তু আমি যখন সূতিকাগারের বাইরে মাস দেড়েকের শিশুমাত্র, তখন ভারতের ভাগ্যে এসেছিল এক পুণ্যলগ্ন, মোহনিদ্রা হতে জাগরণের শুভক্ষণ। পরাধীন ভারতবাসীর ঘুম ভাঙল ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে, কেঁপে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনেদ। শুভ শঙ্খধ্বনি, গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ, রাশিচক্রের বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে বোমা বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক ভূমিকম্প, জনসমুদ্রের জোয়ার কি নবজাতকের ভাগ্য বেশি নিয়ন্ত্রণ করে? ভাগ্য-লিপিকার বৃদ্ধ বিধাতাই হয়তো তা বলতে পারেন।'

বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে কুমিল্লা শহরকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছাত্র-যুবকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগঠন ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন এই অখিলচন্দ্র নন্দী। ১৯৩১ সালের ৬ মে কুমিল্লায় এই সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা ছাত্রসম্মেলনে কলকাতা ও ত্রিপুরা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, বিমল প্রতিভাদেবীর মতো বাংলার শ্রদ্ধেয় নেতা ও বড় বড় বিপ্লবীগণ। অখিলচন্দ্র নন্দীর লেখা 'বিপ্লবী স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে ওই সময়ের কথা বিস্তারিত লেখা আছে। এখানে শুধু লেখকের ভাষায় তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও সংবাদের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো–

"পরিকল্পনা অনুযায়ী বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কনফারেন্সের বিস্তৃত রিপোর্ট ও আমাদের ফটো 'চুন্টা প্রকাশ' কাগজে ছাপবার ব্যবস্থা করলেন। চুন্টার ড. অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই কাগজটি পরিচালনা করতেন। স্টিভেন্স নিধনের পর প্রফুল্ল, শান্তি, সুনীতির ছবি ছাপানোর অপরাধে কাগজের ঐ কপিটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঐ কপির জন্য প্রেসটি তল্লাশি হয়। ড. ভট্টচার্যও নানাভাবে নিপীড়িত হন। চুন্টা প্রকাশ কাগজের ঐ সংখ্যাটি বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তগুপ্তের মারফতে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্প্রতি পেয়েছি। সেই কাগজ থেকে কনফারেন্সের রিপোর্টটি তুলে দিচ্ছি।

চুন্টাপ্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
ত্রিপুরা জিলা ছাত্র ও ছাত্রী সম্মিলনীর
দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

'ত্রিপুরা জিলা ছাত্র সংঘ ও ছাত্রী সংঘের সমবেত উদ্যোগে সমগ্র ত্রিপুরা জিলার ছাত্রছাত্রী সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কুমিল্লায় 'মহেশ প্রাঙ্গণে' মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসংঘের বিশিষ্ট কর্মী স্বর্গীয় অসিতকুমার গুহ নামক যে বালক কিছুদিন পূর্বে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সম্মিলনীর মণ্ডপের নাম রাখা হইয়াছিল 'অসিত নগর'। অসিত নগরের সাজসজ্জা অতি চমৎকার হইয়াছিল। মণ্ডপ গৃহের অভ্যন্তরে 'সানিয়াৎ সেন', 'ডিভ্যালেরা', 'রাসবিহারী বসু' 'যতীন দাস', 'কানাইলাল' প্রভৃতির ছবি বিশেষভাবে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

পাঁচশতের অধিক ছাত্র প্রতিনিধি এবং এক সহস্রাধিক দর্শক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এ ভিন্ন ঢাকা, কলিকাতা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে ত্রিপুরার অনেক ছাত্র আসিয়াছিল। সম্মিলনীর নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, প্রাদেশিক ছাত্রসমিতির সভাপতি কিরণচন্দ্র দাস, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবরবাবু, তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বনমালী ও দুর্গাচরণ বসু প্রভৃতিসহ উপস্থিত হইয়া সম্মিলনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চাঁদপুরে অভ্যন্তরে সমিতির কতিপয় সভ্য, মৌলবী আসরফ উদ্দীন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজমুদার এবং একদল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ট্রেনে কুমিল্লা লইয়া আসেন।

কুমিল্লায় ট্রেন পঁহুছিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং দর্শনাকাঙ্খায় সমস্ত স্টেশন এবং ষ্টেশন হইতে 'অসিত নগর' পর্যন্ত প্রায় এক মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ রাস্তা জনসমুদ্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ট্রেন পঁহুছামাত্র ৫১টি বমের দ্বারা তাঁহাদের আগমন বিজ্ঞাপিত করা হয়। বিপুল জনসংঘের সমবেত কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম' ও 'জয়ধ্বনি'র মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণ এবং শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত-চেয়ারম্যান কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটি, হলধর দাশ, বিনোদ ব্যানার্জী, ললিতমোহন বর্মণ, জিতেন্দ্র দত্ত, মৌলবী সৈয়দ আজিজুল্লা, মুখলেছুর রহমান, আব্দুল মালেক ও অন্যান্য বহু নেতা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি বারো ঘোড়ার গাড়িতে লইয়া যান। ছয়টি সুসজ্জিত হস্তী, অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, দুইশত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, পাঁচশত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, এক হাজার শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক এবং ছয়শত ছাত্রসমিতির স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকা হস্তে অতি শৃঙ্খলার সহিত শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্তের আবাস ভবনে লইয়া যায়।

পরদিন ৭ই মে অপরাহ্নে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা বিমলাপ্রতিভা দেবী কর্তৃক জাতীয় পতাকা উদযাপন উৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মিলনীর মণ্ডপ 'অসিত-নগরের' দ্বারোদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মণ্ডপের ভিতরে তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রায় এক হাজার মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন।

তৎপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণ পাঠ হওয়ার পর রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বিখ্যাত পালোয়ান গোবরবাবু তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বনমালী ও স্বর্গীয় ভীমভবানীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাচরণ বসুর সহিত দেশীয় ও পাশ্চাত্য প্রথায় মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

৮ই মে প্রাতে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

অতঃপর ত্রিপুরা জিলা ছাত্রী সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা বিমলাপ্রতিভা দেবীকে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

অপরাহ্নে অসিত-নগর প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা জিলা ছাত্রসংঘ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ত্রিপুরা জিলা ছাত্রী সংঘের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী একত্রে তাঁহাদের নির্বাচিত সভাপতি এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি সামরিক প্রথায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অধিবেশন সমাপ্তির পর কুমিল্লা ছাত্র সংঘের ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত যুবকবৃন্দ, ছাত্রী সংঘের মহিলা খেলোয়াড়গণ প্রায় এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী কুস্তি, ভার উত্তোলন, লৌহদণ্ড বক্রকরণ, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা যুযুৎসু এবং অন্যান্য শরীর চর্চ্চার কৌশলসমূহ দেখাইয়া দর্শকগণের প্রশংসা লাভ করেন।

পরদিন ৯ই মে সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত ভারতবিখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাড়ে আট ঘণ্টাব্যাপী অবিশ্রান্তভাবে রাণীর দিঘীতে সন্তরণ করেন।

১১ই মে শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস মহাশয়ের শিষ্যগণের লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।"

লেখক: রিসার্চ অফিসার, পিআইবি

বাংলাদেশে মাধ্যম সাক্ষরতা কী, কেন ও কীভাবে?

ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে
ও
মামুন আ. কাইউম

মাধ্যম সাক্ষরতা কী?

উইলবার শ্র্যাম জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর *Mass Media and National Development* গ্রন্থে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, নীতিনির্ধারণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যকারিতার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। অবাধ তথ্যপ্রবাহকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হিসেবে উল্লেখ করে উইলবার শ্র্যাম বলেন, The amount of information available and the wideness of its distribution is thus a key factor in the speed and smoothness of development. শ্র্যামের মতে, গণযোগাযোগের সঙ্গে আন্তর্যাক্তিক যোগাযোগ যুক্ত হলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিপ্লব অর্থাৎ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হবে। শ্র্যামের বক্তব্য বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পুরোপুরি সঠিক কি না, তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও এতটুকু বলা যায় যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি গণমাধ্যমের বার্তাগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি। বিশেষ করে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হওয়া নতুন মাধ্যমের এই যুগে মাধ্যমগুলোয় যেসব অসংখ্য বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কতটা সত্য কিংবা মিথ্যা– এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এসব কারণেই মাধ্যম সাক্ষরতা সম্পর্কে জানা, বোঝা এবং এ সম্পর্কে প্রচারণা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভোক্তাকে আরও সক্রিয়ভাবে গণমাধ্যমের বার্তা/পণ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তা বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে গণমাধ্যম সাক্ষরতা। এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমে এভাবে নাগরিক সাংবাদিকতার উৎকর্ষতাও হতে পারে। সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের পার্থক্য করা, মিউজিক, প্রপাগান্ডা, মন্তব্য এবং তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, তথ্য এবং বিনোদন মিডিয়ায় জাতি, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদির প্রতিনিধিত্ব করা; গণমাধ্যমের মালিকানা এবং অর্থনীতি সম্পর্কে জানা, মিডিয়ার সহিংসতা ও

যৌনতার বার্তাগুলোকে চিহ্নিত করা– এগুলো জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ডিজিটাল মাধ্যমের আবির্ভাবে নিউ মিডিয়া সাক্ষরতারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যেখানে ব্যক্তিগত, গোপন ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি নৈতিক ও আইনগত ইস্যু বাছাই করা হয়। এছাড়াও মাধ্যম সাক্ষরতা ভোক্তা ও কর্মী, বার্তা ও অর্থ এবং উপস্থাপনা ও বাস্তবতার ধারণার সমালোচনাত্মক ভাবনা ও যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রটি এখনো বেশ নতুন এবং এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন রয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া (Hobbs, 2009)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সংখ্যাগত বিচারে অনেক অগ্রসরমান। বিশেষ করে গত তিন দশকে এর সংখ্যা বেড়েছে, যাকে আমরা বলছি 'মিডিয়া ব্যুম' হয়েছে। ক্রমবর্ধমান টেলিভিশন চ্যানেল, পত্রিকা, এফএম ও কমিউনিটি রেডিও এবং অনলাইন পোর্টালগুলো প্রতিনিয়ত সংবাদ ও মতামত তৈরি ও বণ্টন করছে। এগুলোর গ্রাহক, ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বড়ো। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে এবং আট কোটি মানুষের হাতে পৌঁছেছে ইন্টারনেট। সাড়ে সাত কোটির বেশি মানুষ মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এই অগ্রসরতাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের একটি অংশ হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন হলো, মিডিয়া লিটারেসি বা মাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়টি আসলে কী? অনেকেই বিষয়টিকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে– '... a set of competencies that empowers citizens to access, retrieve, understand, evaluate and use, to create as well as share information and media content in all formats, using various tools, in a critical ethical and effective way, in order to participate and engage personal, professional and societal activities.' (ইউনেস্কো, ২০১৩)।

অর্থাৎ মাধ্যম সাক্ষরতা একদিকে যেমন আমাদের মাধ্যম সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করে শিক্ষিত ও সচেতন করতে পারে; অপরদিকে গণমাধ্যমকেও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলতে পারে। মাধ্যম সাক্ষররা বিভিন্ন মাধ্যমে (টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, বই, ম্যাগাজিন, ভিডিও গেমস, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, ইন্টারনেট) প্রাপ্ত সংবাদ বা তথ্য শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং সেগুলো তৈরির প্রক্রিয়া এবং অর্থ এমনকি লুকানো অর্থও খুঁজে বের করতে পারে। তাছাড়া মাধ্যম সাক্ষররা মিডিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজেদের মিডিয়াও তৈরি করে নিতে পারে। (ইমন, ২০১৭)। Hobbs (2009) অবশ্য মিডিয়া সাক্ষরতার প্রভাব নিয়ে বলেছেন, 'মানুষ ডিজিটাল ও গণমাধ্যম সাক্ষর হলে তারা ব্যক্তিগত, করপোরেট এবং রাজনৈতিক এজেন্ডা চিহ্নিত করতে পারে এবং বাদ দেওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তা দাবিও করতে পারে। সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধানের জন্য এসব মানুষ তাদের শক্তিশালী ভয়েস এবং আইনে প্রাপ্ত অধিকার দিয়ে আশপাশের অন্যদের উন্নতি সাধন করতে পারে।'

বাংলাদেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন সেক্টরে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে নতুন। তবে সম্প্রতি ইস্যুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশেষ করে অনলাইন ও মোবাইল ফোনে হয়রানির পরিমাণ বাড়ায় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুস্মিতা এস পৃথা (১৬ মে, ২০১৫) দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার একটি নিবন্ধে (ডিজিটাল হ্যারাজমেন্ট ইন ডিজিটাল বাংলাদেশ) এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়েছেন। এ ছাড়াও গুজব ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সামাজিক অস্থিরতা, হত্যা, রামুর বৌদ্ধমন্দির থেকে শুরু করে রংপুরের পাগলা পীরে সংল্যালঘুদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুণ্ঠনের মতো ঘটনা বাড়ার কারণে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রসারেও এসব ফেক নিউজ এবং গুজব কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যদিও শিক্ষিত মানুষের সংবাদ ও গণমাধ্যমের প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি সাদামাটা সচেতনতামূলক জ্ঞান থাকলেও মানুষের একটা বড়ো অংশের মাঝে তার ঘাটতি রয়েছে। এই জনসচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমের ভোক্তা ও কর্মীদের মাঝে দীর্ঘমেয়াদি শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি কর্মসূচি বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তরুণদের বিশেষ বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট নামে বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা। সংস্থাটি মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম ব্যবহারের অভ্যাস নিয়ে গবেষণা করেছে এবং তা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপদ গণমাধ্যম ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন সেবা (ই-বুক, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম) শিক্ষার্থীদের দিচ্ছে এবং এভাবে বিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়েছে এক ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা।

কেন প্রয়োজন গণমাধ্যম সাক্ষরতা?

দেশে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা চল্লিশোর্ধ্ব, যার মধ্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এসব টেলিভিশনের শ্রোতা বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফাইড অনুষ্ঠানও উপভোগ করতে পারছে। বিশেষ করে ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেল, কার্টুন বা খেলার চ্যানেল এক ধরনের বিশেষত্ব এনেছে এ সেক্টরে। আরও বেশকিছু অনুমোদনপ্রাপ্ত টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। স্যাটেলাইটের কল্যাণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিদেশি অনেক দেশের টেলিভিশন চ্যানেল আমাদের দেশে সম্প্রচার চালাচ্ছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য অনুসারে বর্তমানে ৩,০২৫টি নিবন্ধিত সংবাদপত্র রয়েছে, যার মধ্যে ১,১৯১টি দৈনিক এবং সেগুলোর ভেতর ৪৭০টি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এর বাইরে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত ২৬৭টি পত্রিকার কতগুলো আবার নিয়মিত এবং সার্কুলেশনের দিক থেকে ভালো করছে। উদাহরণ হিসেবে দৈনিক করতোয়া, দৈনিক পূর্বকোণ বা দৈনিক পূর্বাঞ্চলের কথা বলা যায়। (আজাদ, ২০১৮)। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন এবং দেশি এফএম ব্র্যান্ডের রেডিও'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কমিউনিটির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যয় নিয়ে শুরু হওয়া কমিউনিটি রেডিও। প্রথাগত সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলে প্রথাগত প্রচারের সঙ্গে শুরু হয়েছে অনলাইন ভার্সন এবং সেগুলোয় প্রকাশিত সংবাদও মাঝেমধ্যে আলোড়ন তুলছে ভার্চুয়াল জগতে। (আইবিআরএএফ, ২০১৭)। সর্বশেষ মিডিয়া সার্ভের তথ্য (২০১৬) অনুসারে, দেশের শহরাঞ্চলের ৯১ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের ৬৭ শতাংশ মানুষ টেলিভিশন দেখে আর ৪০ শতাংশ সপ্তাহে অন্তত একবার সংবাদপত্র পড়ে এবং ১৫ শতাংশ নিয়মিত রেডিও শোনে। (কামরাল এবং অন্যান্য, ২০১৮)। দেশে প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ কাভারেজ, স্বল্প খরচে এবং গতির কারণে ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা অনেক বেড়েছে। আজ থেকে ১৫ বছর আগেও শুধু সমাজের এলিট শ্রেণির মানুষ ল্যাপটপ ব্যবহার করত, আর ইন্টারনেট ব্যবহারের হারও ছিল অনেক কম। বিশেষ করে দেশের ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে SEA-ME- WE- 4 সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ততা দেশের মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তির এক ধরনের উৎকর্ষতায় নিয়েছে। শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, এমনকি গ্রামের সাধারণ মানুষও একটি স্মার্টফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের (ফেসবুক, ইউটিউব) সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ছোটো ছোটো শিশুও আজ ইউটিউবের কার্টুন এবং রাইমসের মাধ্যমে তাদের মাধ্যম নির্ভরতা শুরু করছে এবং পরে এক ধরনের নেশায় পরিণত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা ব্যবহারকারীদের আপাতদৃষ্টিতে স্বস্তি, বিনোদনের ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ালেও এর ক্ষতিরও কিছু শঙ্কা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। 'অতি তথ্য প্রাচুর্য' এর ব্যবহারকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশেষ করে গণমাধ্যমের ব্যবসা এবং রাজনীতি নির্ভরতার কারণে কোনো সংবাদের সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠতা সত্যিকার অর্থে সচেতন পাঠককে ভাবায়। গণমাধ্যমের আধেয়ে মাঝেমধ্যেই নৈতিকতার বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও মাঝেমধ্যে ক্ষতির সম্মুখীন করে। গণমাধ্যমে এর ব্যবহারকারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন খুবই কম চোখে পড়ে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন নির্ভরতা, বিভিন্ন ইস্যুতে প্রচারণার অংশ হয়ে যাওয়া সত্যিকার অর্থে জনগণের মাধ্যম থেকে এগুলোকে দূরে ঠেলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে অনেক মাধ্যম থেকে অনেক রকম প্রকাশিত/প্রচারিত সংবাদে 'গোলকধাঁধায়' পড়তে হয় আগ্রহীদের। সরকারও ডিজিটাল নিরাপত্তা বা ডাটা নিরাপত্তা নিয়ে কিছু আইন প্রণয়ন করেছে এবং আরও কিছু অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের বাংলা সিরিয়ালগুলো বা পশ্চিমা ধাঁচের অনুষ্ঠানগুলো আমাদের তরুণ সমাজকে 'ডিজুস কালচার'-এ উদ্বুদ্ধ করায় তারা আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলতে শিখেছে। আমাদের আজ পহেলা বৈশাখের চেয়ে থার্টিফার্স্ট নাইট বেশি টানে। সেই সঙ্গে সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন অনুষ্ঠান থাকলে তাতে আগ্রহ আরও বাড়ে। আবার এর অনেক কিছুই অন্য সংস্কৃতি থেকে ধার করে আমরা ব্যবহার করছি, নিজের সংস্কৃতির প্রতি খেয়াল না রেখেই। অন্য সংস্কৃতির ভালো জিনিসগুলো (আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) আমরা নিলে আপত্তি ওঠার কথা নয়; কিন্তু বিশেষ করে তরুণ সমাজ আপত্তিকর আধেয়ের প্রতিই বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছে এবং সেভাবে জীবন পরিচালিত করার মতো ঝুঁকিতে রয়েছে। পণ্যের বিজ্ঞাপনকেও বেশি আকৃষ্ট করতে গিয়ে সংস্কৃতি, নারীর অধিকারকে অনেকক্ষেত্রেই ভুলভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা এক ধরনের ভুল বার্তা দিচ্ছে।

মতপ্রকাশের একটি স্বাধীন মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও তরুণদের অনেকেই মিডিয়া লিটারেসি বা ঝুঁকি, নৈতিকতা এবং এ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি সম্পর্কে জানে না। সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন বা নির্বাচনেও শুধু মিথ্যা তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপরাধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে গুজব ছড়ানোর দায়ে জেলেও যেতে হয়েছে কাউকে। সামাজিক মাধ্যমে বা সাইবার স্পেসে হয়রানি, পর্নোগ্রাফির করাল গ্রাস,

মিথ্যা তথ্য বা প্রপাগান্ডা ছড়ানোর মতো ইন্টারনেট বা গণমাধ্যমের অপব্যবহার খুবই বেশি চোখে পড়ছে ইদানীং। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি অনেকেরই চোখ এড়ায়নি। এমনকি এসব গুজবকে অনেকে সত্য হিসেবেও মেনে নিয়েছে। আসলে ডিনামাইট, অস্ত্র বা ফেনসিডিলের ব্যবহার তখনই মানুষকে স্বস্তি দেয়, যখন তা মানব কল্যাণার্থে ব্যবহার হয়। এগুলোর ব্যবহার তখনই অস্বস্তি তৈরি করে, যখন তা ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার হয়। ঠিক তেমনি ইন্টারনেট ও বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার সঠিকভাবে না করতে পারলে ইন্টারনেটযুক্ত একেকটি স্মার্টফোনই হয়ে উঠতে পারে একেকটি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র।

আমাদের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো নিজ নিজ গ্রুপের পুঁজি, মুনাফা ও ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা, প্রাইভেট বা ব্যবসায়িক খাতের স্বার্থরক্ষা, করপোরেট পুঁজির অনুকূল সংস্কৃতি ও স্বার্থরক্ষা, ব্যবসা অনুকূল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ব্যবসায়ী পরিচালনায় সুশীলসমাজকে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি একটি শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কাজগুলো করে। (নিউটন, ২০০০)। এছাড়াও আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোর ডিজাইন এবং পৃষ্ঠাসজ্জা পরিবর্তন হলেও মান বাড়েনি। সংবাদপত্রগুলো সংবাদের ক্ষেত্রে ইনোভেশন, বস্তুনিষ্ঠতা, ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানী সংবাদ পাঠক চাহিদার সঙ্গে তালমিলিয়ে উপস্থাপন করতে পারছে না। (পাণ্ডে, ২০১১ এবং মারজান, ২০১৩)। বিশেষ করে গণমাধ্যম মালিকানায় রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যের কারণে এগুলোর নৈতিকতার মান কমছে। (বিশ্বাস, ২০১১)। আবার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোও জনস্বার্থের চেয়ে সরকারের পক্ষে একমুখী প্রচারেই বেশি ব্যস্ত থাকে। এগুলোর মান এবং জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে। (শরিফুজ্জামান, ২০১৪)। টেলিভিশন এবং অনলাইন চ্যানেলগুলোর সংবাদের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানে দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের একটি প্রতিযোগিতা চলে এবং তা করতে গিয়ে ভুল তথ্যও পরিবেশিত হয়। আবার লাইভ দেখাতে গিয়ে অনেক বিতর্কিত তথ্যের পরিবেশনা থাকে। এমনকি 'কবরে নেমে' লাইভ সংবাদও পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে টকশোর নামে ঘুরেফিরে অল্পকিছু মানুষকে সেলিব্রেটি বানানো থেকে শুরু করে একপেশে সংবাদ বা আলোচনার অভিযোগও রয়েছে। এমনকি টেলিভিশন চ্যানেলের উপস্থাপনায় বর্ণ এবং জাতিবৈষম্যের বিষয় নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে। আবার টেলিভিশন, সংবাদপত্র, অনলাইন যার কথাই বলি না কেন, অন্যের অনুষ্ঠান, গান বা সংবাদ নিজের বলে চালানোর অভিযোগটাও বহুদিনের। অপরদিকে বেশির ভাগ শ্রোতা, দর্শক বা গণমাধ্যমের ভোক্তাও গণমাধ্যমের আধেয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রেই বড়ো দেওয়াল তৈরি করে। ফলে ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি হয়। এই গ্যাপ দূর করতেই মাধ্যম সাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমকর্মীদের যেমন জনগণের চাহিদা সম্পর্কে জানা জরুরি, ঠিক তেমনি অডিয়েন্সকেও বুঝতে হবে কোনটি গ্রহণ করবে আর কোনটি নয়। এ কারণেই এটি শুধু ভোক্তা-শ্রোতা নয়, বরং নীতিনির্ধারকদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। (Pauluseen et al., 2010)।

অনেক সময়ই গণমাধ্যমকর্মীরা কোনো সংবাদের আগপিছ বিবেচনায় না নিয়ে খবর প্রকাশ করছেন, এমনকি তা লাইভও হচ্ছে। দিল্লিতে বাসে ধর্ষণের খবর বেশি ফলাও করে ছাপানো, নিহত সাংবাদিক সাগর-রুনির ছেলে মেঘকে ঘুম থেকে তুলে লাইভে নেওয়া, মা-বাবাকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার ঐশীর কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে। বিডিআর বিদ্রোহের সময় সৈনিকদের লাইভ ফলাও করে প্রচার বা সন্তানকে খুন করে আত্মসমর্পণ করা বাবার খবর ফলাও করে (বিশেষ করে কোনো ছাকনি ব্যবহার না করে) প্রচারের ক্ষেত্রে বিবেচনা রাখা জরুরি, যাতে এমন কাজে কেউ উদ্বুদ্ধ না হয়। অনেক সময় মিডিয়া ট্রায়ালও হয়ে যাচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে মি-টু'র অভিযোগ আসা মাত্রই তা শেয়ার করা এবং একধরনের হেয়প্রতিপন্নের প্রতিযোগিতাও মাঝেমধ্যে খেয়াল করা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কেউ তা উদ্দেশ্যমূলক করছে কি না বা একজন সাংবাদিক যেমন তার 'বাইফোকাল মাইন্ড' ব্যবহার করেন, তেমনটিও ব্যবহৃত হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জিরোকে হিরো বা হিরোকে জিরো করা যাচ্ছে সহজেই। যে জায়গায় আমাদের গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি রয়েছে। আবার সেলিব্রেটিদের নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের কমতি না থাকায় তাদের সম্মানহানির ঘটনাও সামাজিক মাধ্যমে অহরহ ঘটে থাকে। এ ছাড়াও ইন্টারনেটের কল্যাণে যে কোনো ব্যক্তি (ইন্টারনেটে অভিগম্যতা থাকা যে কেউ) নতুন নতুন মিডিয়া ব্যবহার করে আধেয় তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান আইন, সেসব মাধ্যম ব্যবহারে প্রাযুক্তিক জ্ঞান বা দক্ষতা না থাকা এবং কমিটমেন্টের অভাবে সর্বনাশ ডেকে আনছে নিজের, সমাজের, পরিবারের এমনকি রাষ্ট্রেরও। যেমন– জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তাসকিন আহমেদ ফেসবুকে ছবিসহ প্রথমবার বাবা হওয়ার ছবি পোস্ট করার পর বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্যে তাদের বিয়ের সময়কাল এবং সন্তান জন্ম নেওয়ার সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কিছু ব্যবহারকারী। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি ব্যাখ্যামূলক পোস্ট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাসকিন বলেন, 'আমার বিয়ের সময় বেশকিছু মিডিয়া আবোলতাবোল সংবাদ করে, তখন মানুষ সেটা বিশ্বাস করেই অনেক মন্তব্য করতে থাকে, একটা আক্ষেপ থেকেই উত্তরটা দিয়েছি।' (বিবিসি বাংলা, ২০১৮)।

যা করা যেতে পারে

মাধ্যম সাক্ষরতা বিদ্যালয় পর্যায়ে শুরু করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শিখতে পারবে কীভাবে ইন্টারনেটসহ গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টিও সেখানে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত হওয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশে ইতোমধ্যে এর ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো প্রত্যক্ষ হয়েছে। ডিজিটাল হয়রানি প্রতিরোধের উপায় বা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ কৌশল, গুজব বা অসত্য তথ্য কীভাবে চিহ্নিত ও পরিহার করা যায় তা জানা এবং নিজের অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল এক্ষেত্রে জানানো যেতে পারে। পাশাপাশি নৈতিকভাবে নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য অন্যের তথ্য, চিন্তা, ছবি ব্যবহারে ক্রেডিট দেওয়া এবং অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি শেখানো যায়। অন্যের মতামত ও আদর্শকে শ্রদ্ধার মতো বিষয়ও এখানে থাকতে পারে। দেশের বিদ্যমান আইন জানা ও মেনে চলার বিষয়ও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ইংরেজিতে এ সংক্রান্ত অনেক টুলস, টেকনিক এবং ম্যানুয়াল রয়েছে। সহজ ভাষায় অনুবাদ ও উপযোগী করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজটি যে শুধু সাধারণ মানুষ বা গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, এটি গণমাধ্যমের সঙ্গে যারা কাজ করেন, তাদের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণারও ঘাটতি রয়েছে, যা বাড়াতে পারে পঠনপাঠন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের একটি কোর্সে তা পড়ানো যেতে পারে। গবেষকরাও নীতিনির্ধারণীদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে পারেন। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বয়সভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে মিডিয়া সাক্ষরতার হার নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হাতে নেওয়া যেতে পারে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোও এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করে মাধ্যম সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে বৃহৎ পরিসরে কাজ করতে পারে, যার মাধ্যমে ভিশন-২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. R. Hobbs and A. Jensen / Journal of Media Literacy Education 1 (2009) p. 11

২. Quamral, S.& others (2018), Promoting Media Literacy in Bangladesh: A Baseline Survey on Media Literacy among Secondary Students in Dhaka city, SACMID, Dhaka.

৩. ইউনেস্কো (২০১৩), গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক: কান্ট্রি রিডিনেস অ্যান্ড কম্পিটেন্সিস. প্যারিস: ইউনেস্কো।

৪. ইমন, এম এম আই আই. (২০১৭), আইসিটি ইন্টিগ্রেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: এ স্টাডি অব পলিসি অ্যান্ড প্রাক্টিস, থিসিস সাবমিটেড ফর এমফিল ইন কমপারেটিভ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি অব অসলো, ডিসেম্বর ২০১৭।

৫. এস. পৃথা, (২০১৫, মে ১৬), ডিজিটাল সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট ইন ডিজিটাল বাংলাদেশ। দ্য ডেইলি স্টার। মে ১৬, ২০১৫।

৬. আজাদ, আবুল কালাম (২০১৮), বাংলাদেশ- মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ, ইউরোপিয়ান জার্নালিজম সেন্টার। Accessed from https://medialandscapes.org/country/pdf/bangladesh on 24 December 2018.

৭. আইবিআরএএফ (২০১৭)। মিডিয়া লিটারেসি ইন বাংলাদেশ। Assessed from http:/www.oic-ibraf.org/belgeler.php.

৮. ইসলাম, এস এম শাফিউল এবং মারজান, সৈয়দ মাহফুজুল (২০১৪), বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদের গতিধারা, ডিআইইউ জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সস, ভলিউল-১, জুলাই, ২০১৩।

৯. শরিফুজ্জমান (১১ নভেম্বর ২০১৪), ক্ষয়ে যাচ্ছে বিটিভি, দৈনিক প্রথম আলো।

১০. পাণ্ডে ড. প্রদীপ কুমার এবং রহমান, মাহাবুবুর (২০১০) বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক গতিধারা, যোজন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ বছর পূর্তি প্রকাশনা।

লেখক: লেখকদ্বয় যথাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর ও সহকারী অধ্যাপক

সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা ধারণায়ন ও কর্মপরিকল্পনা অন্বেষণ

মাহামুদুল হক

ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতা ও সফলতার সঙ্গে সাক্ষরতা সম্পর্কিত। কারণ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগণ সাংস্কৃতিক বলয়ে বেশি সুবিধা অর্জন করে। পাঁচ হাজার বছর আগে চিত্রভাষা এবং লিখন আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সমাজে গল্পকথকদের মূল্য ছিল অধিক। কারণ তাদের ছিল সামাজিক অবস্থান এবং মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। ১৪৪৬ সালের দিকে জোহানস গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কার এবং উনিশ ও বিশ শতকে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও-টিভির আবির্ভাব এবং সর্বশেষ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির সংযোজন গণমাধ্যম সাক্ষরতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। গণমাধ্যমঘন প্রতিবেশে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার ধারণাটি প্রচলিত গণমাধ্যম সাক্ষরতারই সম্প্রসারিত রূপ ও রূপায়ণ। সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাবে নতুন প্রযুক্তিনির্ভর জীবনচর্চায় ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য দক্ষতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা অর্জনের কলাকৌশল নিয়ে গবেষণা ও পঠনপাঠন এবং প্রায়োগিক কর্মসূচি প্রণয়ন অপরিহার্য। বর্তমান নিবন্ধে গণমাধ্যম সাক্ষরতা তথা ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার ধারণায়ন, এর প্রয়োজনীয়তা ও উপাদান এবং আবশ্যকীয় দক্ষতাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাও পেশ করা হয়েছে এ নিবন্ধে।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা

সাক্ষরতার জন্য পড়া, লেখা, বলা ও শ্রবণ– এ চারটি মৌলিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। লিখিত প্রতীক দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরীভাবে বুঝতে পারা ও ব্যবহারের সক্ষমতাই হচ্ছে সাক্ষরতা। আর গণযোগাযোগের সব বার্তা বোঝা ও ব্যবহারের সক্ষমতাই গণমাধ্যম

সাক্ষরতা। ইউএস ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া লিটারেসি এডুকেশনের মতে গণমাধ্যম সাক্ষরতা হচ্ছে: 'the ability to access, analyze, create, and act using all forms of communication.' গণমাধ্যম পণ্ডিত পল মেসারিজের মতে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা হচ্ছে সমাজে গণমাধ্যম কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জ্ঞান। গণযোগাযোগ গবেষক জাস্টিন লুইস এবং সাট ঝালি বলেন, বার্তার সৃষ্টি, উৎপাদন ও প্রেরণ সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বাধ্যবাধকতা বোঝাপড়ার দক্ষতাই হচ্ছে গণমাধ্যম সাক্ষরতা। ইউরোপীয় কমিশনের গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ দল গণমাধ্যম সাক্ষরতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: 'Technical, cognitive, social, civic and creative capacities that allow a citizen to access, have a critical understanding of the media and interact with it.' সব প্রযুক্তিগত, জ্ঞানগত, সামাজিক ও নাগরিক এবং সৃজনশীল সক্ষমতা যা নাগরিককে গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেয় এবং আধেয়ের বিশ্লেষণী বোঝাপড়া ও মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করে। গণমাধ্যম সাক্ষরতার প্রধান স্তম্ভ (pillar) হচ্ছে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ (critical thinking)।

গণমাধ্যম-পণ্ডিত আর্ট সিলভারব্লাট তার Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages গ্রন্থে গণমাধ্যম সাক্ষরতার নিম্নোক্ত মৌলিক উপাদান চিহ্নিত করেছেন।

* **গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা:** সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে, তা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত। এ প্রভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। জীবনযাপন প্রণালির ওপর মিডিয়ার প্রভাব অবজ্ঞা করলে ওই ব্যক্তি বা সমাজের ওপর ক্ষতিকর/নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা গণমাধ্যম সাক্ষরতার অন্যতম মৌলিক উপাদান।
* **গণযোগাযোগের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা:** গণযোগাযোগের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের ধারণা থাকতে হবে। গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো জানা থাকলে কীভাবে বার্তা সেবা দেবে তা বোঝা সহজ হয়। কীভাবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়, এসবের রাজনৈতিক অর্থনীতি, দায়বধ্যতা, বাধ্যবাধকতা-নীতি প্রভৃতি বিষয় জানা থাকলে বার্তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।
* **বার্তার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করার কৌশল:** গণমাধ্যমের বার্তা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় চিন্তাগতভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে কৌশল জানতে হয়। কৌশল জানা থাকলে লুকায়িত অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। যেমন, পত্রিকায় সংবাদ ও ছবি ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। এসব নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
* **সংস্কৃতির ধারক হিসেবে গণমাধ্যম বার্তা বোঝা:** আমাদের সংস্কৃতি, জনগণ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, মিথ, উদ্বেগ ও আবেগ সম্পর্কে জানা যায় গণমাধ্যম বার্তায়। সংস্কৃতির ধারক হিসেবে গণমাধ্যম বার্তা বোঝার ক্ষমতা থাকলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো জানা যায়। বার্তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সহজ হয়।
* **বার্তা গ্রহণ, অনুধাবন ও প্রশংসা করার ক্ষমতা:** গণমাধ্যম সাক্ষরতার অর্থ এ নয় যে সর্বদাই বার্তার ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করতে হবে বা বর্জন করতে হবে। বার্তা গ্রহণ, অনুধাবন বা প্রশংসা করার দক্ষতাও গণমাধ্যম সাক্ষরতা। স্ট্যানলি জে ব্যারেন তার Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture গ্রন্থে বলেন: 'Learning to enjoy, understand, and appreciate media content includes the ability to use multiple points at access– to approach media content from a variety of directions and derive from it many levels of meaning, Thus, we control meaning making our own appreciation.'
* **গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে জানা:** গণমাধ্যমের কার্যক্রম ও আধেয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ম-নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। যেমন, টিভিতে সহিংসতা ও রক্তাক্ত লাশ দেখাল। এটা কি নীতিসম্মত? কীভাবে দেখাল? আমরা কি এসব পরিত্যাগ করার জন্য দাবি করতে পারি? হ্যাঁ, এসব নিয়ম-নীতি জানা থাকলে এর ক্ষতিকর প্রভাব চিহ্নিত করে তা আর প্রচার না করার জন্য বলতে পারি।
* **যথোপযুক্ত ও কার্যকরী আধেয় উৎপাদন:** প্রথাগত সাক্ষরতা হচ্ছে লেখা ও পড়ার দক্ষতা। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শুধু কার্যকরী ও নিপুণতার সঙ্গে আধেয় অনুধাবন নয়, কার্যকরভাবে ব্যবহারের দক্ষতাও। গণমাধ্যম সাক্ষর জনগণের আধেয় উৎপাদনের দক্ষতাও থাকতে হবে।

সাক্ষরতা এখন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত প্রপঞ্চ। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা গণমাধ্যম সাক্ষরতার পরিবর্তক ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতীকের মাধ্যমে বার্তার আদান-প্রদানের দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল দক্ষতার সংমিশ্রিত ধারণাই ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা। এটি মূলত 'নিউ মিডিয়া লিটারেসি'। যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও তা ব্যবহারের দক্ষতা। ডিজিটাল যুগে সাক্ষরতায় যুক্ত হয়েছে নানা উপাদান ও নান্দনিকতা, ভাষা, অডিও-ভিডিও, গ্রাফিক, শব্দ, মিউজিক-মিথস্ক্রিয়া, আবেগ-অনুভূতি ও বৈচিত্র্যময় টেক্সট। এজন্য সাম্প্রতিক সমাজে টিকে থাকতে প্রয়োজন হচ্ছে নানা নৈপুণ্য ও দক্ষতার। নতুন নতুন ধরন ও ধারণার উদ্ভব হচ্ছে আধুনিক তথ্যসমাজে। যেমন– তথ্য সাক্ষরতা (information literacy), মাধ্যম সাক্ষরতা (media literacy), গণমাধ্যম শিক্ষা (media education), ভিজুয়াল সাক্ষরতা (visual literacy), সংবাদ সাক্ষরতা (news literacy), স্বাস্থ্য মাধ্যম সাক্ষরতা (health media literacy) এবং ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা (digital literacy)। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে এমনকি মাত্র কয়েক বছর আগে এসব পদবাচ্য বিশেষ ক্ষেত্র ও মেধাগত চর্চা থেকে উৎসারিত। এদের উৎসগত দিক একই পরিবারভুক্ত। যেমন– তথ্য সাক্ষরতা গবেষণা দক্ষতার সঙ্গে, সংবাদ-বিজ্ঞাপন-বিনোদন গণমাধ্যম সাক্ষরতার সঙ্গে এবং কম্পিউটার-ইন্টারনেট-সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার ও বার্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের দক্ষতাই হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা। শুধু টেকনিক্যাল দক্ষতা নয়, ডিজিটাল প্রতিবেশে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা। সক্রিয়ভাবে আধেয়র অনুসন্ধান ও ব্যবহার, বার্তা নিয়ে অনুপুঙ্খ চিন্তা, বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও প্রশংসা বা বার্তা তৈরির দক্ষতাই ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা।

সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা

মানব ইতিহাসের যে কোনো সময় থেকে বর্তমানে শিশু ও যুবকরা অতিমাত্রায় তথ্য ও বিনোদন গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। বাসা-বাড়িতে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট ও হাতে স্মার্টফোন, শত শত অফলাইন-অনলাইন রেডিও-টিভি চ্যানেল আজ সহজপ্রাপ্য। চাহিদানুযায়ী গুগলে অবারিত তথ্য ও বিনোদন অন্বেষণের সুযোগও রয়েছে। সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তথ্য, সংবাদ, বিনোদনসহ বৈচিত্র্যময় আধেয় (এসব ভালো, মন্দ বা অপ্রয়োজনীয় হতে পারে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবার নাগালের মধ্যে চলে আসছে। প্রথাগত গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়া সংস্কৃতিতে আনন্দ-বিনোদন অন্বেষণ করছে বাধাহীনভাবে। ইন্টারনেটের বদৌলতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চিত্র ও ছবি শেয়ার করাসহ ভার্চুয়াল জগৎ থেকে শিখছে। নিজেই আবার রান্নবান্না থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ হাজারও রকম বিষয়ে আধেয় তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন অনলাইন নেটওয়ার্কে আপলোড করছে। অবারিত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তাও বেশ অনুধাবিত হচ্ছে। বর্তমান জ্ঞান সমাজে বিদ্যায়তনে পাঠ শুরু করার আগ থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত উদীয়মান প্রযুক্তি এবং এর হাতিয়ার সম্পর্কে জানতে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা সহিংসতা, পর্নগ্রাফি, গল্প-গুজবনির্ভর ব্লগ, সংবাদের ছদ্মাবরণে জনসংযোগ এবং অনৈতিক মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে ক্ষতিকর ও নিম্নমানের পণ্য প্রসারের মহোৎসব চলছে। ঘৃণ্য কিছু ওয়েবসাইট কুসংস্কার, যৌনতা, বর্ণবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, সাইবার সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে অনলাইন প্রতিবেশে। অনলাইনে উত্ত্যক্তকরণ, বিরক্তকরণ, হয়রানি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এসব মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তার জন্য বড়ো হুমকি। গণমাধ্যম সাক্ষরতার অভাবে মেধাস্বত্ব, মালিকানা বা সামাজিক অবস্থানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে জ্ঞানগত ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হচ্ছে নতুন গণমাধ্যমঘন প্রতিবেশ। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত, পেশাগত ও সামাজিক পরিশুদ্ধি লাভের জন্য এসব জ্ঞান ও দক্ষতা শুধু ঐচ্ছিক বা আবশ্যকীয় নয়, ডিজিটাল নাগরিক হওয়ার অপরিহার্য উপাদানও বটে। ডিজিটাল নাগরিক তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাইট কমিশন Informing Communities: Sustaining Democracy in the

Digital Age শীর্ষক রিপোর্টে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ডিজিটাল গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণে তিনটি সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

সুপারিশ ৬: ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় অফিসিয়ালদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সব স্তরে আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে ডিজিটাল ও গণমাধ্যম সাক্ষরতাকে একীভূতকরণ।

সুপারিশ ৭: বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য ডিজিটাল ও মিডিয়া প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগার ও অন্যান্য কমিউনিটির প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুদান ও সহযোগিতা প্রদান।

সুপারিশ ১২: স্থানীয় কমিউনিটির তথ্য ও যোগাযোগ সাক্ষরতার উন্নয়নে যুবকদের সংযুক্তকরণ।

২০১৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অন্যান্য প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের মতোই বিতর্কিত ছিল। ভোটারদের নির্বাচন সংবাদ গ্রহণ করার ওপর ওই নির্বাচনের ফল অনেকটা নির্ভর করেছিল। কেননা, নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকান সংবাদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল (Shearer & Gottfried, 2017)। প্রথাগত মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য থাকে। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদ ডিজিটাল নাগরিকদের সংস্পর্শে এসে 'ভুয়া' সাংবাদে পরিণত হয়। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পর ভুয়া সংবাদ প্রপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য বিকল্প মিডিয়ায় প্রচারিত হতে থাকে। তবে এ ভুয়া সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে কতমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল, তা এখনো অজানা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা বিশ্বের মিডিয়া সংস্কৃতিতে মিথ্যা তথ্য (disinformation) ও ভুয়া সংবাদ এখন একটা সংকটে পরিণত হয়েছে।

সমস্যা সমাধানে তথ্যের প্রবেশযোগ্যতার গণতন্ত্রায়ণ অপরিহার্য। কিন্তু তথ্যের গ্রহণযোগ্যতাবিষয়ক গবেষক সাম উইনিবার্গ এবং সারা ম্যাকগ্রা বলেন, 'The internet has democratized access to information but in doing so has opened the floodgates to misinformation, masquerading as dispassionate analysis.' কীভাবে এসব মিথ্যা তথ্য, বিকৃত তথ্য বা ভুয়া সংবাদ যাচাই-বাছাই করা যায়? এর গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিইবা কী? একটা ধারণা প্রচলিত যে সোশ্যাল মিডিয়ার বেশির ভাগ তথ্য সঠিক নয়। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য বা বিকৃত তথ্য অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মিডিয়া ম্যানিপুলেশন ঠেকানো সম্ভব নয়। এসব বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর অনুসন্ধান গণমাধ্যম সাক্ষরতা পঠনপাঠনের আলোচিত বিষয়। ভুয়া সংবাদ, মিথ্যা তথ্য বা বিকৃত তথ্য ও সংবাদ যাচাই-বাছাইয়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতা অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আজ পরিগণিত।

শিক্ষক থেকে আইনপ্রণেতা, দাতা থেকে প্রযুক্তিবিদসহ সব অধিগোষ্ঠী গণমাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া লিটারেসি এডুকেশন তৃতীয় গণমাধ্যম সাক্ষরতা সপ্তাহ পালন করেছে। আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ও স্টোনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এ গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে 'Media Literacy@ Your Library' কর্মসূচি নিয়েছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষও 'Journalism Project' ঘোষণা করেছে। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের গণমাধ্যম সাক্ষরতা বৃদ্ধি এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কালিফোর্নিয়ার আইনপ্রণেতারা দুটি বিল পাস করেছেন, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষা বোর্ডগুলো গণমাধ্যম সাক্ষরতার ওপর পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে। জন এস অ্যান্ড জেমসস এল নাইট ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্রে ২০টি গণমাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচিতে এক মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। ২০১৬ সালে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ২ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার জন্য অনুমোদন দিয়েছে দুটি পাইলট প্রকল্প চালু করতে। ২০১৮ সালের প্রথমদিকে গুগল ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতার উৎকর্ষে তিন বছরের জন্য ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা ঘোষণা করেছে। 'Google News Initiative' ভুয়া তথ্য ও সংবাদ ও গণমাধ্যম সাক্ষরতার জন্য সহায়তা করছে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অবস্থান প্রতিবছর জানার জন্য ওপেন সোসাইটি ইনিশিয়েটিভ সোফিয়া নিউ মিডিয়া লিটারেসি ইনডেক্স প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশে ডিজিটাল মাধ্যমে গুজব ছড়ানোয় বেশকিছু ভয়াবহ সহিংস ঘটনা ঘটেছে। ফেসবুকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধবিহার ও তাদের বাড়িঘরে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালানো হয়। সহিংসতা ওই জেলার উখিয়া ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ২৪টি বৌদ্ধবিহারসহ হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর করা হয়। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২৫ হাজার ব্যক্তি এ ঘৃণ্য সহিংসতায় অংশগ্রহণ করে। পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করা সংবলিত একটি বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য সংবলিত ওই ফেসবুক পোস্ট করা হয় একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর নামে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ২০১৬ সালের নভেম্বরে আরেকটি বিকৃত ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ১০০টি বাড়িঘর এবং ১০টি মন্দির ভাংচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কাবার ছবিতে হিন্দু দেবতার ছবি ফটোশপ করে বিকৃতভাবে বসানো হয়। ২০১৭ সালের নভেম্বরে রংপুর জেলার ঠাকুরপুরে আরেকটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ৩০টি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার অভাবে এসব সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

সরকার ফেসবুকে গুজব প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ২০১৫ সালের প্রথমদিকে দুই সপ্তাহের জন্য ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করা হয়। এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে চাঙা করতে ফেসবুকের মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ ছিল। দেশের বেশির ভাগ জনগণ স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইন্টারনেটের ব্র্যান্ডউইথ ফোর-জি থেকে থ্রি-জিতে নামানো হয়। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশন বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানায়, সরকার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে এর ব্যবহার কমানোর পরিকল্পনা করছে। Statcounter Global Stats-এর তথ্যানুযায়ী (নভেম্বর ২০১৮), সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯২.৫৫ শতাংশই ফেসবুক ব্যবহার করে। সম্প্রতি সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস করেছে। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা সবার মধ্যে থাকলে গুজবকেন্দ্রিক উদ্ভূত পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। এ ধরনের আইন পাস করা প্রয়োজনও হয়তো হতো না।

সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন তথ্য জানা নাগরিকদের অংশগ্রহণ। গণমাধ্যম তথ্যদানের কাজটি করে। গণমাধ্যমের তথ্য-বার্তা যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণে গণমাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বর্ণবাদ ও রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা প্রতিরোধে গণমাধ্যম সাক্ষরতা সহায়ক। ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে পরিবর্তনশীল নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতেও ডিজিটাল সাক্ষরতা অপরিহার্য। তবে গণমাধ্যম সাক্ষরতাকে ডিজিটাল প্রতিবেশে সংঘটিত সব রোগের ওষুধ বলা যাবে না। এই গণমাধ্যমঘন জটিল পরিবেশে একটি পরিকাঠামো মাত্র। প্রতিনিয়ত নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রযুক্তি তথ্যকে প্রভাবিত করছে। কীভাবে আমরা এর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করছি, ব্যবহার করছি, তা অনুধাবনীয় বিষয়। কীভাবে সমস্যাসংকুল সংবাদঘন প্রতিবেশকে গণমাধ্যম সাক্ষরতা প্রতিরোধ করবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া ভুয়া সংবাদ গণমাধ্যম সাক্ষরতা দিয়ে কি যাচাই-বাছাই করা যায়? অথবা মিথ্যা তথ্য বা প্রপাগান্ডা? এজন্যই ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার সব দিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতাসমূহ

প্রথাগত গণমাধ্যম ও ডিজিটাল মাধ্যমের আধেয় গ্রহণ খুবই সহজ। বাটন চাপলেই টেলিভিশন দেখা যায়। অথবা রেডিও শোনা যায়। পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লগ-ইন করা যায়। আর টাকা খরচ করে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন কেনা বা চলচ্চিত্র দেখা যায়। কিন্তু গণমাধ্যম সাক্ষরতা বা ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে আরও কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। জীবনভর শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আটটি প্রধান দক্ষতা অর্জনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশল নির্ধারণ করেছে। দক্ষতাগুলো হচ্ছে:

* মাতৃভাষায় যোগাযোগ করার ক্ষমতা
* বিদেশি ভাষায় যোগাযোগ
* গাণিতিক দক্ষতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মৌলিক দক্ষতা
* ডিজিটাল দক্ষতা
* শিখতে শেখা
* সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা
* উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার জ্ঞান
* সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও অভিব্যক্তি

ডিজিটাল দক্ষতা গণমাধ্যম সাক্ষরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ; কিন্তু তা ডিজিটাল প্রযুক্তির জ্ঞানের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। আরও অনেক দক্ষতার সঙ্গে আন্তসম্পর্কিত। ডিজিটাল প্রতিবেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার ক্ষেত্রে

ইউরোপিয়ান অ্যাপ্রোচ (European approach to media literacy in the digital environment) একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, যেখানে ডিজিটাল প্রতিবেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা অর্জনের জন্য প্রথাগত ও নতুন উপাদানগত দক্ষতা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন–

* বিদ্যমান সব গণমাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। সংবাদপত্র থেকে ভার্চুয়াল কমিউনিটি, ইন্টাররেক্টিভ টিভিসহ সক্রিয়ভাবে গণমাধ্যমের ব্যবহার করতে হবে। ভার্চুয়াল জগতে অংশগ্রহণ, সম্ভাব্য সব বিনোদন অন্বেষণ, সাংস্কৃতিক প্রবেশযোগ্যতা ও মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি নিশ্চিত করাসহ গণমাধ্যমের ব্যবহার করতে হবে।
* আধেয়র মান, বিশ্বাসযোগ্যতা ও সঠিকতার ওপর অনুপুঙ্খ দৃষ্টিভঙ্গি।
* সৃজনশীলভাবে মাধ্যমের ব্যবহার।
* গণমাধ্যমের অর্থনীতি, মালিকানা ও বহুত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান।
* কপিরাইট সম্পর্কে জ্ঞান।

এসব দক্ষতা ডিজিটাল প্রতিবেশে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতাকে বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। যুক্তিসংগত চিন্তা, যোগাযোগ, তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা হচ্ছে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার জন্য আরও কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন–

* আধেয়র প্রতি মনোযোগী হওয়া, তা অনুধাবন এবং বার্তার বাধা (নয়েজ) সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও ক্ষমতা থাকতে হয়। গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ার নয়েজ সম্পর্কে সজাগ থাকা আবশ্যকীয়। এ নয়েজ নিজস্ব আচরণের মধ্যে লুকায়িত। টেলিভিশন দেখার সময় একই সঙ্গে আমরা খাবার খাচ্ছি, পড়ছি, গল্প করছি বা মোবাইল ফোনে কথা বলছি বা ফেসবুক দেখছি। এসবই নয়েজ। আধেয় অনুধাবন বা অর্থ অনুধাবনে এসব আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত।
* ডিজিটাল মাধ্যমের আধেয়র প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা আছে, তা বিবেচনা করার দক্ষতা থাকতে হবে। ডিজিটাল সাক্ষর জনগণকে বুঝতে হবে যে এসব আধেয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আচরণের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম।
* ডিজিটাল সাক্ষর জনগণের আবেগগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে যুক্তিসংগত বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা থাকতে হবে।
* আধেয়র অর্থ অনুধাবনে মনোযোগী থাকতে হবে।
* উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা যা-ই হোক না কেন, আধেয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করার দক্ষতা থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম বিশ্বাসযোগ্য কারণ তা শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্যতম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এজন্য গণমাধ্যমকে সরকারের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। কারণ আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের সহায়ক ও সম্পূরক হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম। তবে এর অর্থ এই নয় যে ডিজিটাল মাধ্যমে যা কিছু প্রচারিত হবে তার সব বিশ্বাস করতে হবে।
* গণমাধ্যমের আধেয়র নিজস্ব একটি ভাষা ও স্টাইল আছে। এসবসহ আধেয় নির্বাচন, সম্পাদনা, প্রকাশ বা প্রচারের স্থান বা সময়, পরিভাষা, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে।

টেক্সট ও প্রযুক্তির ব্যবহারসহ জ্ঞানগত, আবেগগত সামাজিক সাক্ষরতাকে ধারণ করে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা। এ সক্ষরতার জন্য অনুপুঙ্খ চিন্তা ও বিশ্লেষণ, আধেয়র সৃজনশীল উৎপাদন, নৈতিকতার চিন্তা এবং নেটওয়ার্ক ও দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা অপরিহার্য। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা অবশ্যই জনগণকে ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক এজেন্ডা নির্ণয় করতে এবং কমিউনিটির অপ্রকাশিত বক্তব্য বা পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপন করতে সহায়তা করবে। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষর জনগণ জোরালো ভয়েস দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করে সমাজকে জঞ্জালমুক্ত করবে।

ডিজিটাল যুগে দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন। এজন্য পাঁচটি মৌলিক দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ পাঁচটি দক্ষতা ক্ষমতায়নে একসঙ্গে কাজ করে। আধেয় গ্রহণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জীবনভর সক্রিয় শিক্ষণে সহায়তা করে। যেমন–

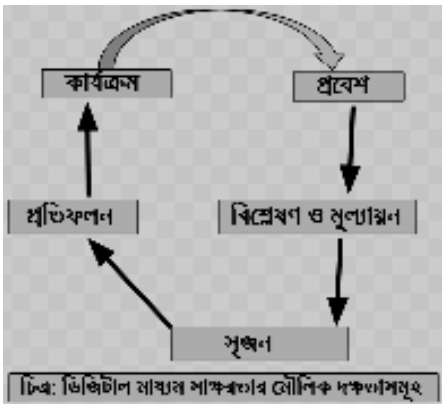

চিত্র: ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার মৌলিক দক্ষতাসমূহ

প্রবেশ: গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির হাতিয়ারসহ দক্ষতার সঙ্গে অনুসন্ধান ও ব্যবহার এবং যথাযথ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য আদান-প্রদান করার দক্ষতা।

বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন: বার্তা অনুধাবন এবং বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা, সত্যতা ও মান বিশ্লেষণে অনুপুঙ্খ চিন্তার প্রয়োগ ঘটানো।

সৃজন: উদ্দেশ্য, দর্শক ও উৎপাদন কৌশল বিবেচনা করে নিজস্ব ভঙ্গিতে বিশ্বাস রেখে সৃজনশীলভাবে বার্তা উৎপাদন করার দক্ষতা।

প্রতিফলন: নিজস্ব স্বীকৃতি এবং জীবনের অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ ও আচরণের জন্য সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক ভিত্তি প্রয়োগ করার দক্ষতা।

কার্যক্রম: কর্মক্ষেত্র ও কমিউনিটি এবং স্থানীয়, জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আদান-প্রদান ও সমস্যা সমাধানে স্বতন্ত্রভাবে এবং যৌথভাবে কাজ করার দক্ষতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অ্যাসোসিয়েশন মাধ্যম-সাক্ষর যোগাযোগকারীর নিম্নোক্ত দক্ষতা চিহ্নিত করেছে:

* ব্যক্তিগত ও জনজীবনে কীভাবে জনগণ গণমাধ্যম ব্যবহার করে তা বোঝার ক্ষমতা।
* ডিজিটাল নাগরিক ও গণমাধ্যমের জটিল সম্পর্কগুলো শনাক্ত করার দক্ষতা।
* সামজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে উৎপাদিত গণমাধ্যমের আধেয়কে গ্রহণ করার দক্ষতা।
* লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গণমাধ্যমের ব্যবহার।

সম্প্রতি ওয়েব ব্রাউজার মজিলা '২১ শতকের দক্ষতাসমূহ' চিহ্নিত করতে ওয়েব লিটারেসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করেছে। এ ফ্রেমওয়ার্ক তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– পড়া, লেখা ও ওয়েবে অংশগ্রহণ। মূল দক্ষতাগুলো হচ্ছে– সমস্যা সমাধানমূলক, যোগাযোগ, সৃজনশীলতা ও সহযোগিতা। এ চারটি প্রধান দক্ষতার আরও ১৪টি সহশ্রেণিগত দক্ষতা রয়েছে, যা মজিলা কর্তৃক প্রণীত নিচের ওয়েব লিটারেসি ফ্রেমওয়ার্কে দেখা যায়।

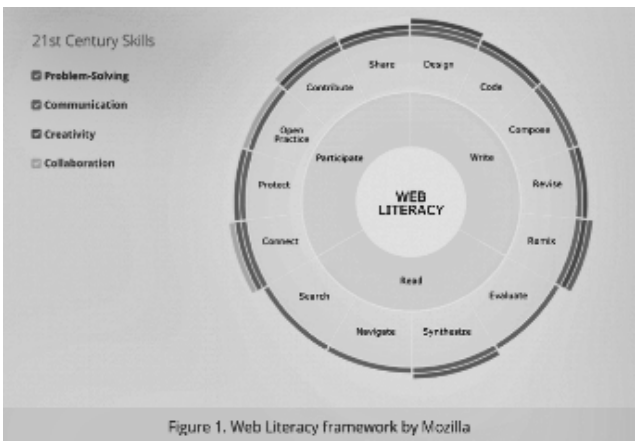

Figure 1. Web Literacy framework by Mozilla

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সুপারিশমালা

১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বাস। একক কোনো কর্মসূচি দিয়ে সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য কমিউনিটিভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি প্রয়োজন। কৌশলগত অংশীদারত্বের আদলে কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার জন্য অপরিহার্য। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান ও স্থানগুলো হতে পারে নিম্নরূপ।

নিজস্ব বাসস্থান: ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো নিজ বাড়িতে শেখা ও শেখানো যেতে পারে। বাসায় বসেই জনগণ মূলত টেলিভিশন দেখে, রেডিও শোনে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে, সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন পড়ে। বাসায় পিতামাতাকে যথাযথভাবে সংযুক্তকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো শিশু ও যুবকদের শেখানো যেতে পারে। এজন্য পিতামাতাকে এসব জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রেরণা দিতে হবে। পিতামাতাই সন্তানদের ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে সন্তানও হতে পারে বয়স্ক পিতামাতার ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষক।

বিদ্যায়তন: প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গণমাধ্যম ব্যবহার, আধেয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং সৃজনশীল আধেয় উন্নয়নে সহায়তা করবে এসব কর্মসূচি। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার উচ্চতর দক্ষতাগুলোর উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ ও অ্যাডভোকেসির মতো বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যেমন– স্থানীয় কোনো বিষয়ে সংবাদ কাভারেজ। কোনো সামাজিক বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে সেসব দক্ষতার উন্নয়ন।

গ্রন্থাগার: গ্রন্থাগারগুলোয় সাধারণ জনসাধারণের জন্য কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজার জন্য সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার, গ্রন্থাগার সফটওয়্যার ও ডেটাবেজসহ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে ও আধেয়র বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা উন্নয়নে মডেল শিক্ষক হতে পারে গ্রন্থাগারিকরা।

যুবকদের জন্য কর্মসূচি: প্রথাগত ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে আধেয় সৃষ্টি ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে এমন ছোটো ছোটো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এসব কর্মসূচি যুবকদের কার্যকরী যোগাযোগ ও সমাজিক অনুসমর্থনের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচির জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।

* প্রযুক্তির হাতিয়ারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নেওয়া যার মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রবেশযোগ্যতা ও ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে করা যায়।
* গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলা।
* ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার ধারণাকে জনপ্রিয় করা।
* আধেয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা ও মান যাচাইয়ে জনগণের সক্ষমতা বাড়ানো।
* সংবাদ ও চলতি ঘটনাবলি বিদ্যায়তনিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে আনয়ন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পরিচালিত এক গবেষণায় গণমাধ্যম, জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে তিন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে।

আধেয়ের ঝুঁকি	যোগাযোগ ঝুঁকি	আচরণগত ঝুঁকি
সহিংসতা, যৌনতা, বর্ণবাদী বা ঘৃণ্য উপাদানে ভরপুর আপত্তিকর বা ক্ষতিকারক আধেয়	যোগাযোগ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন চর্চা, যেখানে জনগণ হয়রানি, উত্ত্যক্তকরণ বা এ ধরনের আচরণের সঙ্গে জড়িত। অপরিচিত ব্যক্তি এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গোপনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়।	আচরণগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ডাহা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, ব্যক্তিগত তথ্য গ্রহণে প্রেরণাদান, অবৈধ ডাউনলোড, জুয়া, হ্যাকিংসহ আরও অনেক কিছু।

সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন দরকার। এক্ষেত্রে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় উদ্যোগ অপরিহার্য। সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন শিশু, যুবক, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও কিশোর অপরাধীদের লক্ষ করে কর্মসূচি নিতে হবে। বাসাবাড়ি থেকে গ্রন্থাগার এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম থকবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিচের কর্মসূচিগুলো নেওয়া যেতে পারে।

* প্রথমত, ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করতে হবে। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে ছোটো ছোটো অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
* সরকারি গ্রন্থাগার, জাদুঘর বা অন্যান্য কমিউনিটি কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে যাতে অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সাক্ষর করে গড়ে তুলতে প্রযুক্তি-দক্ষতাসম্পন্ন যুবকদের সংগঠনগুলোকে সহায়তা দিয়ে কাজে লাগাতে হবে।
* বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
* কমিউনিটি মিডিয়া ও প্রথাগত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা।
* জনসংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচিতে সংযুক্তকরণ। সংবাদমাধ্যম ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
* শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা উন্নয়নে অনলাইন ভিডিও ডকুমেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল সাক্ষরতার কৌশলগত দিক সম্পর্কে নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিপালন।
* অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নৈতিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য বিনোদন-শিক্ষায় (entertainment-education) নিয়োজিত বিনোদন শিল্পের সৃষ্টিশীল প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণ।
* সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা– এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন যোগাযোগ কর্মসূচি নিতে হবে। প্রতিবছর 'ডিজিটাল মিডিয়া সাক্ষরতা সপ্তাহ' পালন করতে হবে।
* ডিজিটাল মাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও সাক্ষর জনগণের জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আয়োজন করতে হবে। সেখানে অবশ্যই প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকবে এবং ডিজিটাল ইনোভেশন ও সাক্ষরতা কর্মসূচির সফল অভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হবে।
* জাতীয় বাজেটে ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে আলাদা বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে সিলেবাস তৈরি করে পঠনপাঠন শুরু করার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা পলিসি প্রণয়ন করাও জরুরি।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা পঠনপাঠনে ব্যক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণী দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বেশির ভাগ গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক পণ্ডিত কমিউনিটির সমষ্টিগত জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে জনগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করার দক্ষতা অর্জন করে সামষ্টিক অবদান রাখতে পারে। যদিও বেশির ভাগ গণমাধ্যম সাক্ষরতার প্রশিক্ষণে ব্যক্তির দক্ষতা উন্নয়নে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু কমিউনিটি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র অথবা প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সমষ্টিগতভাবে ও সমন্বিতভাবে ডিজিটাল সাক্ষরতা উন্নয়নে পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Mason, M. (2017). Fake News 101? Lawmakers want California schools to teach students how to evaluate what they read on the web, Los Angels Times [Online], Available at www.latimes.com/politics/essential/la-pol-ca-essential-politics-updates-los-angeles-assemblyman-proposes-bill-1484182108-htmlstory.html [Retrieved on 11 December 2018].
2. Marwick & Lewis (2017) as cited in Bulger & Davison (2018). The Promises, Challenges, and Future of Media Literacy, Journal of Media Literacy Education, 2018 10(1).
3. Shearer, N. & Gottfried, J. (2017). News Use Across Social Media Platforms, Washington DC: Pew Research.

লেখক: গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ

বিবর্তনের ধারায় মিডিয়া লিটারেসি

সেকাল ও একাল

কুদরত-ই-মওলা

মিডিয়া লিটারেসি-মাধ্যম-দৃষ্টিভঙ্গি: সহজ ভাষায় মিডিয়াকে যথাযথভাবে ব্যবহার এবং তাতে পরিবেশিত তথ্য বুঝে ও ভালোমন্দ ঠিক-বেঠিক মূল্যায়ন করে অন্যের বোধগম্য করে উপস্থাপন করাকে মিডিয়া লিটারেসি বলে। বাংলায় একে বলা যায় মিডিয়া জ্ঞান বা মিডিয়া সাক্ষরতা।

এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। সোজা কথায়, কোনো একটি মাধ্যমে (সংবাদ বা সামাজিক মাধ্যম) পরিবেশিত তথ্য জানার পর তা যাচাই-বাছাই না করে কিংবা তথ্যটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে কি-না, তা খুঁটিয়ে না দেখে, সরাসরি কাউকে বললে বা কোনো মাধ্যমে পরিবেশন করলে, ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকেই যায়। সেজন্য, যে মাধ্যমে তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে সেটা ব্যবহারের যাবতীয় নিয়ম এবং এতে পরিবেশিত তথ্য মূল্যায়ন করে এবং তা অন্যের বোঝার উপযোগী করে পরিবেশনের জ্ঞানটুকু থাকলে সমস্যার সম্ভাবনা কমে আসে। সংবাদমাধ্যমে এধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে, কারণ আজকাল পত্রিকা, রেডিও-টিভি সবই অনলাইনে পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে সংবাদমাধ্যমের পরিবেশিত ভুল সংবাদ শেয়ারিংয়ের সুবাদে বড়ো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

বহুল প্রচলিত মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে (সংবাদপত্র, রেডিও-টিভি), বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রচলন হওয়ার গোড়ার দিকে লিটারেসি'র বা ওই মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জানা ও তা ব্যবহারের জন্য কমবেশি জানাশোনার প্রয়োজন ছিল। সেসব ক্ষেত্রে এখন তেমনটি নেই। বর্তমানে, ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যম বা নিউ মিডিয়ার জন্য (যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটস-আপ, ইউটিউব) বিষয়টি একই রকম। তবে, জানা থাকা দরকার, নিউ মিডিয়া এখনো ম্যাস-মিডিয়া বা গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমের স্বীকৃতি পায়নি। এটির

নাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। কাজেই এতে পরিবেশিত তথ্য মানসম্পন্ন সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত তথ্যের মতো বস্তুনিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই, সেই তথ্যকে সত্য জেনে হুবহু তা পরিবেশন করলে বা শেয়ার করলে সমস্যা হতে পারে। সেজন্যই প্রয়োজন মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া ও মিডিয়ার তথ্য ব্যবহারের সম্যক জ্ঞান।

অন্যদিকে, গণমাধ্যমে বা নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যমে তথ্যগুলো হিসাব-নিকাশ বা দেশ-কাল-পাত্র যাচাই-বাছাই করে, শ্লীলতাসহ যাবতীয় নীতি বজায় রেখে এবং কোনো পক্ষ যাতে অযথা ক্ষতির শিকার না হয়; এসব দিক খেয়াল করে তথ্য পরিবেশন করা হয়।শুধু তাই না, ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য প্রতিটি গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বা সরকার নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এমনকি এজন্য মানহানি বা আদালত অবমাননার মতো মামলার মুখোমুখি হতে পারে। এসব দায়বদ্ধতার মধ্যে সেখানে কর্মরত সংবাদকর্মীদের কাজ করতে হয়। যেটি সংবাদমাধ্যম নয়, সেক্ষেত্রে সাবধানতার প্রয়োজন থেকেই যায়।

মিডিয়া লিটারেসি'র অভাবে, ভুল বা বানোয়াট তথ্য পরিবেশন সমাজে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তা উঠে এসেছে বিবিসি'র একটি সাম্প্রতিক গবেষণা-নির্ভর প্রতিবেদনে (বিঅন্ড ফেক নিউজ)। প্রতিবেদনটি দেখিয়েছে, হোয়াটস-আপ মেসেজ, ফেসবুক ও টুইটারে ভুল/বানোয়াট তথ্য পরিবেশনের কারণে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ও ভারতে সহিংসতা হয়েছে এবং বিগত বছরগুলোতে এসব দেশে বেশ কজন প্রাণ হারিয়েছে। বাংলাদেশে চিত্র তেমনটি নয়, তা নয়। এদেশেও একাধিক ব্লগার প্রাণ হারিয়েছে ফেসবুক স্ট্যাটাসের কারণে।

এবার আসা যাক, মিডিয়া তথা আজকের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মিডিয়া পর্যন্ত আমরা কীভাবে আসলাম এবং মিডিয়া লিটারেসিও কীভাবে বিবর্তিত হলো। সেই পথ পরিক্রমাটাইবা কেমন ছিল। প্রযুক্তিনির্ভর মিডিয়া বা গণমাধ্যমের বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলেই তা পরিষ্কার হবে আশা করি। সেই সঙ্গে, আমরা পেয়ে যাব, নিত্যনতুন মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির আবিষ্কারের ধারা।

প্রযুক্তি- গণমাধ্যম- মিডিয়া লিটারেসি : মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া সাক্ষরতার যাত্রার সঙ্গে গণমাধ্যমের গড়ে ওঠার বিষয়টি সরাসরি জড়িত। গণমাধ্যম যত প্রসার হয়েছে বা বৈচিত্র্য এসেছে, মিডিয়া লিটারেসি'র প্রয়োজনীয়তা তত বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যমের ধরন পাল্টানোর সঙ্গে পাল্টেছে মিডিয়া লিটারেসির ধরনও। অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, আধুনিক সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এক কথায়, প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম বা ম্যাস-মিডিয়ার ইতিহাস ও মিডিয়া লিটারেসি নিয়ে নানা কর্মকাণ্ড একরকম হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

প্রযুক্তির আবিষ্কার ও গণমাধ্যমের বিবর্তন: সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই যোগাযোগের প্রয়োজনেই প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম তথা গণমাধ্যমের সাহায্য নিয়েছে মানুষ। প্রথম 'গণমাধ্যম' শব্দটি পাওয়া যায় ৬৮০ সালে চীনে। সেসময় সেখানে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। তবে প্রায় ৮০০ বছর পর (১৪৫৩ সালে) ছাপামেশিন আবিষ্কারের পর গণমাধ্যম বিস্তার লাভ করে। স্থিরচিত্র নির্ভর করে, প্রথম মোশান পিকচার তৈরির উপযোগী যন্ত্র, জেট্রোটাইপ আবিষ্কার হয় ১৮৩৩ সালে। পূর্ণাঙ্গ মোশান পিকচার তৈরির জন্য কাইনিওটোগ্রাফিক ক্যামেরার দেখা মেলে তারও প্রায় ৬০ বছর পর, ১৮৯১ সালে। ইতোমধ্যে, বছরখানেক আগে মার্কিন বিজ্ঞানী মার্কোনি আবিষ্কার করলেন রেডিও। যদিও, রেডিও বা বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের দাবিদার বাংলাদেশের জগদীশচন্দ্র বসুসহ আরো কয়েকজন। শুরু হয়, ইলেকট্রনিক মিডিয়াভিত্তিক প্রযুক্তির যুগ। এই প্রযুক্তির সুবাদে বেতারযন্ত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির কথা মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে, শুধুমাত্র শব্দ বা কথা শোনা যেত, ছবি দেখার সুযোগ ছিল না। টিভি আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। রেডিও'র সাহায্যে শুধু শব্দ শোনা যেত। টিভিতে শব্দ ও ছবি উভয়ই দেখা বা দেখানো সম্ভব হলো।

তবে, ইলেকট্রনিক টিভি'র ব্যবহারিক জীবনে যাত্রা শুরু হয় ১৯২৭ এ যুক্তরাষ্ট্রে। টিভি সংবাদের সূচনা করে দকে, যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস ইংলিশ নিউজ ১৯৪৮ সালে। বিবিসি ১৯৯৭ সালে দ্রুত জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এটি খুব জুৎসই মাধ্যমে পরিণত হলে গণমাধ্যমটির ক্ষমতা বা শক্তি টের পায় কমবেশি সবাই। তাই, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালের নির্বাচনি প্রচারণা চলাকালে, টিভি বিতর্ক সরাসরি প্রচারিত হলো। ঘটনাটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল দেশে-বিদেশেও। এতে অংশ নেন দুই শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেটর ডেমোক্র্যাট নেতা জন কেনেডি ও রিপাবলিকান প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন।

১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ গণমানুষের ব্যবহারের জন্য এলো আধুনিক পারসোনাল কম্পিউটার। যদিও এই প্রযুক্তির আবিষ্কার তারও ২০ বছর আগে। বাংলাদেশে তা হাতের নাগালে পাওয়া গেল সত্তরের শেষদিকে। সাধারণের ব্যবহারে আসতে লেগে গেল আরো ১০ বছর। ইন্টারনেট বিশ্বে সাধারণের নাগালে আসে নতুন সহস্রাব্দ ২০০০ সালের শুরুতে। একে একে যোগ হয় মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, আইফোন। সঙ্গে নিয়ে এলো ফেসবুক, টুইটার-ইউটিউব। এ মাধ্যমগুলোর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। সেজন্য, এই মাধ্যমে প্রচারের জন্য বিবিসি-সিএনএন টিভিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো (টিভি-রেডিও এবং অফলাইন ও অনলাইন পত্রিকগুলো) তাদের প্রধান প্রধান খবরগুলো চট করে এসব মাধ্যমে শেয়ার করছে। ইন্টারনেটের নিত্যনতুন অ্যাপসের বাহারি ব্যবহারের কথা না হয় নাই বলি।

তবে, যে কথাটি না বললেই নয়। তাহলো, মানবসমাজ যেমনটি প্রযুক্তির উন্নয়নকে স্বাগত জানিয়েছে। ঠিক তেমনি প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকটি নিয়েও ভেবেছে, এভাবনা থেকে এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তৈরি করেছে আইন। গড়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা গবেষণা কেন্দ্র ও প্রকাশনা। এসবই মানুষের জন্য। সমাজের জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে এসবের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে জানান দেওয়ার জন্য। সরাসরি বলতে হয় সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

আইন, সহযোগী সংস্থা ও প্রকাশনা: প্রথম রেডিও অ্যাক্ট রচিত হয় ১৯১২ সালে এবং বাণিজ্যিক সম্প্রচার আরো বছর আটেক পর। যুক্ত হয় বিজ্ঞাপন ও যুক্তরাষ্ট্রের উইফ রেডিও স্টেশনে প্রথম। এদিকে, গণমাধ্যমের সমানতালে, যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে গড়ে ওঠে সোসাইটি ফর ভিজ্যুয়াল এডুকেশন (১৯১৯), ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডাল্ট এডুকেশন (১৯২৯), ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট (১৯৩৩) ও ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড (১৯৩৯)।

বিশ্বের একাধিক দেশে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে ওঠার সাথে সাথে প্রকাশিত হয় মিডিয়া লিটারেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা ও লেখাজোখা। যেমন প্রথম ক্যামেরা ম্যাগাজিন 'কোডাকেরি' (১৯১৩), ভিজ্যুয়াল এডুকেশন জার্নাল (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৪), সাপ্তাহিক রেডিও নিউজ ম্যাগাজিন 'ব্রডকাস্টিং' (১৯৩১), আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেনের ব্রডকাস্টিং বিষয়ক মাসিক 'নিউজ লেটার' (১৯৩৫) ও যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের বৈঠকের ওপর লেখা নিবন্ধ 'শিশু-কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রভাব' (১৯৫৪-'৫৫)।

পরবর্তীতে বিশ্বসমাজ গণমাধ্যম বা ম্যাস-মিডিয়াগুলোর ভালোমন্দ নিয়ে আইন-গবেষণা-প্রকাশনাকে জাতীয় গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। সেই লক্ষ্যে, গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন সংগঠন। তাদের উদ্যোগে দেশে-বিদেশে সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এগুলোর অন্যতম হলো: 'ইন্টারন্যাশনাল মিটিং অন টিভি টিচিং' (নরওয়ে, ১৯৬২), সিম্পোজিয়াম 'চিলড্রেন অ্যান্ড টিভি' ও টিভি সহিংসতা কমাতে– 'সার্জান জেনারেল' পরার্মশ কমিটি (যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৭২) এবং গড়ে তোলা হয় 'অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া লিটারেসি' (এএমএল, টরেন্টো, কানাডা, ১৯৭৮)। এছাড়া, ১৯৮০ সালে ফ্রান্সে ইউনেস্কো'র উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মিডিয়া লিটারেসি শিক্ষকদেরও সম্মেলন (১৯৮০)।

পাশাপাশি নামজাদা প্রকাশনা সংস্থাগুলো এগিয়ে এলো। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত গণযোগাযোগ বিষয়ক লেখক উইলবার শ্র্যাম লিখলেন 'ইম্প্যাক্ট অব এডুকেশনাল টিভি' (১৯৭০), জন বার্জার প্রকাশ করলেন 'ওয়েজ অব সিইং' (১৯৭৩)। এসব লেখালেখিতে উৎসাহিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন 'সেন্টার ফর মিডিয়া ভ্যালুজ' নিয়মিতভাবে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রকাশ শুরু করে ম্যাগাজিন 'মিডিয়া ভ্যালুজ', যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। কানাডার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হলো এ বিষয়ে বিশেষ পাঠ্য 'চিলড্রেন অ্যান্ড মিডিয়া' (২০০০)। সেই ধারাবাহিকতায়, সচেতন সমাজ নতুন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম ও বিনোদন মাধ্যমগুলোতে ব্যবহার হওয়া বিষয়বস্তু নিয়ে ভেবেছে। ভাবনায় এসেছে টিভি, ভিডিও গেম ও কম্পিউটারের কুফল। এভাবেই মিডিয়া লিটারেসি'র আলোচনায় চলে আসে 'ভিজ্যুয়াল লিটারেসি'। এই পরিভাষাটি প্রথমবারের মতো ব্যবহার করলেন জন ডেবস্ তাঁর একটি কলামে।

কার জন্য মিডিয়া লিটারেসি: বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে এগিয়ে থাকা সমাজে মিডিয়া লিটারেসিকে ঘিরে যেসব **আইন** রচিত হয়েছে, **সহযোগী সংস্থা** গড়ে উঠেছে **ও প্রকাশনা** এসেছে এসবেরই কেন্দ্রবিন্দু শিশু-কিশোর। যারা জাতির ভবিষ্যৎ। এরা, সবচেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি নতুন নতুন প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যমের দিকে সহজে ঝুঁকে পড়ে। রপ্তও করে দ্রুত।

বর্তমানে, সমাজের এই অংশের জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ইন্টারনেট। এই ডিজিটাল জেনারেশনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণও হতে পারে ইন্টারনেট। শুধু তারই মিডিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে চলবে না। তাদের গুরুজনদেরও এসব বিষয়ে জানতে হবে। তাদেরকে ভালোমন্দ বোঝার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে নিজেদের তাগিদেই।

ডিজিটাল যুগে মিডিয়া লিটারেসি ও বাংলাদেশঃ ডিজিটালাইজেশনের যুগে, বিশ্ববিবেক নিশ্চুপ আছে, এমন ভাবার সুযোগ নেই। তাহলে, দেশে-বিদেশে ইন্টারনেটভিত্তিক মাধ্যম বা গণমাধ্যমগুলোতে তথা নিউ মিডিয়ায় মিডিয়ার যুগে 'মিডিয়া লিটারেসি'র হাল হকিকতইবা কেমন!

বর্তমানে, বিশ্বে এগিয়ে থাকা অনেক দেশের তুলনায়, বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশন এগিয়ে। সংগত কারণেই, আমাদের দেশের চিন্তাবিদ, সমাজসেবক সরকারের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। যেমনটি ইউরোপের দেশগুলোতে দৃশ্যমান। ইন্টারনেট চালু করার সাথে সাথেই তারা, জাতীয় পর্যায়ে এই মাধ্যমের নিরাপত্তায় বিভিন্ন ধরনের লিটারেসি বা শিক্ষার ব্যবস্থা করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে। এর আওতায় আনা হয় সংশ্লিষ্টদের– ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক।

এসব কর্মসূচির মূল চালিকাশক্তি সরকার প্রণীত 'জাতীয় কৌশল'। সঙ্গে থাকতে পারে, সারাদেশে জনসচেতনতাসহ উপ-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগ। তাহলে, তরুণরা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারে কোন মাধ্যম কতটুকু ব্যবহার করবে। ফেসবুক, ইউটিউবে কতটা সময় দেবে।

সর্বত্রই, জাতীয় কৌশল তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট সবার (শিশু-কিশোর-শিক্ষক-অভিভাবক) পর্যবেক্ষণ নিয়ে। এই কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও সহযোগিতার মাধ্যমে চলতে পারে উপ-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগ।

আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পাঠ্যক্রমে। উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে হাতে-কলমে নিরাপদে ও কার্যকরীভাবে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারের যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং জনসেবায় সাইবার ক্রাইম ইউনিট।

উপ-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মিডিয়া লিটারেসি কর্মসূচিগুলো জাতীয় (বা আনুষ্ঠানিক) কর্মসূচির পরিপূরক। সবকটিরই উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন। শিশু- কিশোর-যুবকদের নিরাপদে অনলাইন মাধ্যমটি ব্যবহার এবং এ থেকে নিজের পেশায় কাজে লাগানোর সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা দেওয়া। এধরনের কার্যক্রমে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে কাজটি সারা যায়। ইউরোপের অনেক দেশে তেমনটি রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য সেমিনার, মুক্ত আলোচনা ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। বাংলাদেশে এধরনের উদ্যোগ প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার ও তার কনটেন্ট নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে চিন্তাভাবনা চলছে। মনিটরিং চলছে। সঙ্গে রয়েছে, সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত সেবার জন্য পুলিশের সেল। এসবেরই আরো প্রচার ও প্রসার দরকার। যা এককভাবে সরকারের দায়িত্ব নয়। আইটি বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবকদেরও এব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই, অনলাইন প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম বা গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার আমরা নিশ্চিত করতে পারব।

প্রকৃতপক্ষে, মিডিয়ায় পরিবেশিত তথ্য বুঝে ও বিশ্লেষণ করে অন্যকে সেই তথ্য যথাযথভাবে আবার উপস্থাপন বা পরিবেশনের কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে পেশাজীবী সাংবাদিক। আর, মিডিয়ায় ঠিকঠাক মতো যথাযথভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করতে ও অন্যের সঙ্গে শেয়ার করার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালোভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকের বিকল্প হতে পারে না। বোধ করি, সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত লোকজন যদি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা তথা মিডিয়া লিটারেসি বিষয়ে জনসচেতনতায় কার্যকরী ভূমিকা না নেন, তাহলে খোদ সাংবাদিকতা আরো বড়ো হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, মূল ধারার সাংবাদিকতায় পাঠক বা শ্রোতা-দর্শক আস্থা উত্তরোত্তর কমলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো কোনো মাধ্যম থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ইপ্সিত তথ্য জানতে চাইবে এবং ভুল বা বানোয়াট তথ্যের ফাঁদে পা দিতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, মিডিয়ায় পরিবেশিত তথ্য বুঝে ও বিশ্লেষণ করে অন্যকে সেই তথ্য যথাযথভাবে আবার উপস্থাপন বা পরিবেশনের কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে পেশাজীবী সাংবাদিক। আর, মিডিয়ায় ঠিকঠাক মতো যথাযথভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করতে ও অন্যের সঙ্গে শেয়ার করার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালোভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকের বিকল্প হতে পারে না। বোধ করি, সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত লোকজন যদি, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা তথা মিডিয়া লিটারেসি বিষয়ে জনসচেতনতা কার্জকরী ভূমিকা না নেন, তাহলে খোদ সাংবাদিকতা আরো বড়ো হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, মূলধারার সাংবাদিকতায় পাঠক বা শ্রোতা-দর্শক আস্থা উত্তরোত্তর কমলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো কোন মাধ্যম থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ইপ্সিত তথ্য জানতে চাইবে এবং ভুল বা বানোয়াট তথ্যের ফাঁদে পা দিতে পারেন।

লেখকঃ বার্তা সম্পাদক, ডিবিসি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রসঙ্গঃ গণমাধ্যম সাক্ষরতা

কামরুন নাহার

বেশ ক'বছর আগে একবার গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলাম বেড়াতে। যে রুমে বসলাম, সেখানে একটি শোকেসে সারি সারি লতা হারবাল স্পট কিউর ক্রিমের খালি বাক্স সাজানো ছিল। আমি আমার ভাইয়ের মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কে ব্যবহার করেছে?' ও বলল, 'আন্টি আমিই ব্যবহার করেছি।' আমি বলেছিলাম, 'এই ক্রিম ব্যবহার করে তোর তো কোনো উপকার হয়েছে বলে মনে হয় না। তুই কার পরামর্শে এটি ব্যবহার করছিস?' ও উত্তর দিয়েছিল, 'আন্টি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে আমি আর আমার বান্ধবী এটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু দেখেন কোনো কাজই হয়নি।' কাজ যে হয়নি, সেটা আমি ওর স্কিন দেখেই বুঝেছিলাম।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে কলকাতার জি বাংলার সিরিয়াল পছন্দের শীর্ষে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যখনই যেখানে গিয়েছি, দেখেছি জি বাংলার সিরিয়াল চলছে এবং নারী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সেই সিরিয়াল গোগ্রাসে গিলছে। আরও মজার ব্যাপার হলো, তাদের মধ্যে যারা বড়ো, তাদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানা। আমি অনেকের কাছেই জানতে চাই, তারা এই সিরিয়াল দেখে কী শেখে? এসব সিরিয়ালে তো সংসার ভাঙা, পরকীয়া, কোটনামি বা একজনের পেছনে আরেকজনের লেগে থাকা ছাড়া আর কিছুই শেখার নেই। তাদের উত্তর, তারা এসব দেখে মজা পায়। বিশেষ করে নারীরা সুন্দর শাড়ি, চুড়ি আর টিপের ভক্ত হয় এসব দেখে, সঙ্গে শেখে মেকআপ করা। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে কী পরবে, কীভাবে সাজবে, সেটা তারা এই সিরিয়াল দেখে শেখে।

২০০০ সালের ২৭ অক্টোবর ভারতে মোহাব্বাতে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে তুলনামূলক ধনিক একটি অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি কালচারাল সেন্টার এবং দেশি

কিছু সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ে ভায়োলিন শিখতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের বক্তব্য ছিল, তাদের প্রিয় নায়ক শাহরুখ খান এত সুন্দর ভায়োলিন বাজান, তাই তাদেরও শিখতে হবে। অথচ তাদের এটুকু মাথায় ছিল না যে, শাহরুখ খান ভায়োলিন বাজাতে পারেন না, তিনি সিনেমায় ভায়োলিন বাজানোর অভিনয় করছেন মাত্র।

এ তিনটি ঘটনায় আর কিছু হোক না হোক– লতা হারবাল ক্রিমের বিক্রি বেড়েছে, জি বাংলার টিআরপি বেড়েছে, সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি বেড়েছে। মোদ্দাকথা, মিডিয়ার মুনাফার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে। আমাদের কোনো উপকার কি হয়েছে নিজের পকেট খালি এবং নীতিনৈতিকতা বিসর্জন হওয়া ছাড়া? আমাদের পকেটও খালি হতো না কিংবা নীতিনৈতিকতার স্খলনও হতো না যদি আমরা জানতাম মিডিয়ার এই আধেয়গুলোকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে অথবা আদৌ গ্রহণ করতে হবে কি না। অর্থাৎ ন্যূনতম মাধ্যম সাক্ষরতা বা মিডিয়া লিটারেসি যদি আমাদের থাকত, তাহলে আমরা বুঝতাম কোনটা গ্রহণ করব বা কোনটা বর্জন করব। তাই মিডিয়া লিটারেসি থাকাটা জরুরি।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শিশুকে অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্য থেকে দূরে রাখার নাম মাধ্যম সাক্ষরতা (Media Literacy) নয়। বাচ্চাদের জন্য তুলনামূলক কম উপযুক্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান টিভিতে প্রচার শুরু হলে অনেক সময়ই আমরা টিভি বন্ধ করে দিই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা খুব জরুরি যে, আমাদের নিত্যযাপন, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে গণমাধ্যম এমনভাবে প্রোথিত যে, শুধু টিভি বন্ধ করে গণমাধ্যমের প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। মিডিয়া সমাজকে প্রভাবিতই করছে না শুধু 'মিডিয়াই সংস্কৃতি'।

সুতরাং মিডিয়া লিটারেসি হচ্ছে যোগ্য, সমালোচক এবং গণমাধ্যমের সব শাখায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা, যাতে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের নিয়ন্ত্রণটা একজনের হাতে থাকে। অর্থাৎ তারা যা দেখে, যা শোনে, তা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে; আধেয় আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে না, আমরা আধেয়কে নিয়ন্ত্রণ করব।

মাধ্যম শিক্ষিত হওয়ার জন্য মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত মুখস্থ রাখা জরুরি না। জরুরি হলো একটা কিছু দেখার, শোনার বা পড়ার পর কেন সেটা হলো, সেই প্রশ্ন করতে শেখা।

পৃথিবীর যত তথ্য আমরা জানি, তার অধিকাংশই জানি মিডিয়ার কল্যাণে। বাস্তবে পৃথিবীটা যা, তার হুবহু প্রতিফলন না ঘটিয়ে মিডিয়া পরিবর্তন, পরিবর্ধন অর্থাৎ ঘষেমেজে পৃথিবীকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে।

একজন মাধ্যম সাক্ষর ব্যক্তি

১. গণমাধ্যমকে পথ প্রদর্শন করে যেসব নিয়ামক, একজন মিডিয়া সাক্ষর ব্যক্তি সেই প্রভাব বা নিয়ামক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।
২. গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক ব্যাপারে আপডেটেড থাকে।
৩. গণমাধ্যমের আধেয়কে সংস্কৃতি শিক্ষার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনায় রাখার ব্যাপারে সংবেদনশীল।
৪. নৈতিক গতিশীলতায় গণমাধ্যমের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে সংবেদনশীল।
৫. গণমাধ্যমের আধেয়কে রাজসিকভাবে উপভোগে সক্ষম।

গণমাধ্যমের মূলনীতি (প্রিন্সিপ্যাল)

যখন আমরা সাক্ষরতার কথা বলি, তখন লিখিত কোনো তথ্য বা প্রকাশিত ছবি, সংকেত ঠিকঠাক বুঝতে পারা গেল কি না, তা বোঝায় বা বুঝি। কিন্তু যখন মাধ্যম শিক্ষার কথা বলা হয়, তখন আরও বেশি কিছুর কথা বলা হয়ে থাকে। ১৯৯২ সালের ৭ থেকে ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত মাধ্যম সাক্ষরতায় জাতীয় নেতৃত্ব সম্মেলনে (National Leadership conference on Media Literacy) বলা হয়েছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে তথ্যপ্রাপ্তি, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং যোগাযোগের নামই মিডিয়া লিটারেসি। বিশ্ব সম্পর্কে যা জানি বা যতটুকু জানি, তার অধিকাংশই আমরা গণমাধ্যম থেকে পাই।

মিডিয়া লিটারেসি দক্ষতা বাড়াতে, দায়িত্বশীল হতে এবং মিডিয়া আমাদের জীবনে কীভাবে ভূমিকা রাখবে, তা আরও বিস্তারিত ও সমালোচনামূলকভাবে বুঝতে এবং মিডিয়াকে ব্যবহার করতে একজন মিডিয়া সাক্ষর ব্যক্তিকে গণমাধ্যমের আধেয় সম্পর্কে কিছু মূলনীতি জানতে হবে।

১. **গণমাধ্যম স্বতন্ত্র বাস্তবতা তৈরি করে:** আমাদের ব্যক্তিগত অবজারভেশন এবং অভিজ্ঞতার পাশাপাশি মিডিয়া ব্যক্তিগত বাস্তবতার স্বতন্ত্র বিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে। আমরা যা বাস্তব হিসেবে ধরে নিই, তার বেশির ভাগই মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত। কখনো কখনো মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত আধেয় এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়লেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যখন রেডিও শুনি, পত্রিকা পড়ি বা নেট ব্রাউজ করি এবং এসব মাধ্যম থেকে যে আধেয় পাই, সেসব আধেয়রই বাস্তবের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল নেই। এমনকি আমাদের ঘরের নিত্যদিনের সাথী টিভির সব আধেয়ও আমাদের বিনাবিচারে গোগ্রাসে গিলে ফেলা উচিত নয়। কারণ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণমাধ্যমে আধেয় তৈরি করা হয়। এমনকি গণমাধ্যমের যেসব আধেয় খুব স্বাভাবিক, সাধারণ আধেয় বলে মনে হয় বা বাস্তবতার প্রতিফলন বলে মনে হয়, সেখানেও ব্যবসায়িক নানা উদ্দেশ্য থাকে।

২. **গণমাধ্যম বাণিজ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত:** যারা গণমাধ্যমে কাজ করেন, তারা ব্যবসায়িক ভাবনা মাথায় রাখেন। আর এসব প্রতিষ্ঠান যারা ম্যানেজ করেন বা মালিক যারা, তাদের মাথায় বিজ্ঞাপন বিক্রির কথা, রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার কথাই সবার আগে আসে বা বলা চলে

> গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিসিয়া অফটারহেইড এবং অন্যদের মতে, টিভি, সিনেমা, ম্যাগাজিন প্রত্যেকটি মাধ্যমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রথা ও কোড আছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মতো করে সবকিছুকে তুলে ধরে

সবসময়ই থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন টিভিতে কোনো অনুষ্ঠান দেখে বা রেডিওতে গান শোনে, তখন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে এই আধেয়র জন্য কে অর্থলগ্নি করেছে। এই গান, নাটক বা সিনেমা তৈরির পেছনে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তটা কী ছিল, কাদের ছিল; এই পণ্যের বিস্তার এবং প্রদর্শনে কী ধরনের অর্থনৈতিক চাপ ছিল! আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, গণমাধ্যমের যে ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা, সেটায় মালিকানার ব্যাপারটিও জড়িত। যদি একই কোম্পানির একটি রেকর্ডিং স্টুডিও, আলাদাভাবে সিনেমা স্টুডিও, একটি ক্যাবল টিভি সার্ভিস কোম্পানি, একটি টিভি চ্যানেল বা রেডিও, একটি পত্রিকা বা প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা থাকে, তাহলে তার পক্ষে গণমাধ্যমের জন্য আধেয় প্রস্তুত, বিতরণ, বিপণন– সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আর এসব ক্ষেত্রে ছোটোগুলোর তুলনায় বড়ো কোম্পানিগুলোর সুযোগ বেশি থাকে, কারণ একই সঙ্গে তারা একই তথ্য নানা মাধ্যমে প্রচার করতে পারে। অর্থাৎ কনভারজেন্সের সুযোগ বেশি থাকে এবং সেই সঙ্গে লাভের মাত্রাও ওপরের দিকে থাকে।

৩. **গণমাধ্যম রাজনৈতিক প্রভাবে/চাপে প্রভাবিত:** একটি সমাজ পরিচালনায় শাসনের পদ্ধতি ঠিক করে সেই সমাজের রাজনীতি। আর রাজনীতির প্রভাব যখন গণমাধ্যমে দেখা যায়, তখন তার বহুমুখী কাজ দেখা যায়। সরকার প্রণীত নিয়মকানুনসহ সরকার কী কী নিষেধাজ্ঞা

আরোপ করতে পারে বা পারে না, আদালত কর্তৃক প্রণীত সেই বিষয়গুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন দল যারা গণমাধ্যম কী করছে, তা পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়ার যে চেষ্টা, তার সবই এই কাজের মধ্যে পড়ে। অনেক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের মতে, গণমাধ্যম একটি রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই ভাবনা বা এ বিষয়ে সচেতন থাকা 'এই পরিবেশ মিডিয়ার আধেয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে' সেই ধারণার জন্ম দেয়। অর্থাৎ তাদের মতে, এর মানে হলো– আমাদের সচেতন হতে হবে যে গণমাধ্যমের যে আইডিওলজি, তার সঙ্গে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে।

৪. **গণমাধ্যম নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিচালিত:** গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিসিয়া অফটারহেইড এবং অন্যদের মতে, টিভি, সিনেমা, ম্যাগাজিন প্রত্যেকটি মাধ্যমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রথা ও কোড আছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মতো করে সবকিছুকে তুলে ধরে। এ বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি না ভাবলেও বা লক্ষ না করলেও এটা নিশ্চিত যে, একটু খেয়াল করলেই মাধ্যমগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদনের উপস্থাপন পত্রিকা, টিভি, রেডিও, ব্লগ কিংবা অনলাইন নিউজ পোর্টালে স্পষ্টতই নিজস্ব স্টাইলে উপস্থাপিত হয়। তবে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো বা আমরা একমত হব একটা বিষয়ে আর তা হলো, প্রতিটি গণমাধ্যম তা রেডিও বা টিভি হোক কিছু বিষয়ের উপস্থাপনের ধরন একই রকম। তারা সব বিষয়কে একটি গল্প বলা পদ্ধতিতে একত্রিত করে; যেগুলোকে আমরা বিনোদন, সংবাদ, তথ্য, শিক্ষা বিজ্ঞাপন হিসেবে চিনি। একজন মিডিয়া লিটারেট ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে শিখতে হবে আধেয়কে প্রভাবিত করে সেই মিডিয়া ফ্যাক্টরটি কী, সেই পদ্ধতিটি কী, যা প্রকাশিতব্য আধেয়কে প্রকাশিত হতে বাধা দেয়।

৫. **অডিয়েন্স মিডিয়ার সক্রিয় গ্রহীতা:** গণমাধ্যমের প্রকাশিত তথ্যের অর্থ উদ্ধার করা বা মানে দাঁড় করানোটা গণমাধ্যমের আধেয় ও অডিয়েন্সের মধ্যকার একটি চলমান মিথস্ক্রিয়া। অডিয়েন্স নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে আধেয়র অর্থ দাঁড় করায়। এছাড়াও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক পটভূমি, লিঙ্গ এবং এমন আরও অনেক বিষয় আমাদেরকে ফিল্টারিঙে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর গুরুত্বারোপ করার পরও মিডিয়ার বৃহত্তর সামাজিক গুরুত্বের বিষয়টি থেকেই যায়। কারণ অসংখ্য মানুষ গণমাধ্যমের আধেয় শেয়ার করে এবং একটা বড়ো অংশ মনে করে, গণমাধ্যমের সামাজিক গুরুত্ব অনেক।

৬. **গণমাধ্যম আমাদের সমাজকে তুলে ধরে:** গণমাধ্যমে মানুষ তার সমাজ সম্পর্কে যা দেখে, তা চাইলে গ্রহণও করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে। মানুষ গণমাধ্যমে তার নিজের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন দেখতে চায়। মজার বিষয় হলো, তাদের মধ্যে একই সঙ্গে এ বিষয়টাও কাজ করে বা করে থাকতে পারে– অন্য একজন একটি বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান যেমন, সহিংস কোনো অনুষ্ঠান দেখে প্রভাবিত হতে পারে। একজন মাধ্যম সাক্ষর ব্যক্তি পক্ষপাতিত্বের খেয়াল রাখে। বিতরণ ও প্রদর্শিত হওয়া সবকিছুর মধ্যেই একজন মিডিয়া লিটারেট ব্যক্তি ধারণা ও মূল্যবোধ (আইডিয়া, ভ্যালুস) খুঁজে পায়।

হরলিক্স টলার, স্ট্রঙ্গার আর শারপার করে তাই বাচ্চাকে হরলিক্স খাওয়ানো জরুরি। আমাদের দেশের শিক্ষিত মায়েরা এই এক বিজ্ঞাপনে হরলিক্সের পুরো দোকান বসিয়ে দেন নিজের ঘরে। অথচ আদালতে এটা প্রমাণিত যে, হরলিক্স এমন কিছুই করে না এবং বিশ্বের বহুদেশে হরলিক্স ব্যান্ড প্রোডাক্ট। কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপনগুলো আমাদের দেশে এমনভাবে প্রস্তুত যে সেগুলো মা এবং বাচ্চা উভয়কে হিপনোটাইজ করে রেখেছে এবং মায়েরা দেদার হরলিক্স কিনছেন। বাচ্চাদের কথা বাদ দিলাম তারা অবুঝ। কিন্তু আমাদের লেখাপড়া জানা মায়েদের তো এইটুকু জ্ঞান থাকা দরকার যে, মিডিয়া হরলিক্স বিক্রির জন্য চমকপ্রদ সব বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, যেখানে লাভ হচ্ছে টিভি আর হরলিক্স কোম্পানির; কিন্তু পকেটের টাকা যাচ্ছে আমাদের। সুতরাং মিডিয়া লিটারেসি কী, সেটা জানা এবং সেই মতো আচরণ করা আমাদের মিডিয়া কনজিউমারদের জন্য জরুরি।

তথ্যসূত্র

1. Turow, Joseph, Media Today , 2014;5: 20-23
2. https://www.medialit.org/reading-room/what-media-literacy-definitionand-more
3. https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/
4. http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, পিআইবি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাধ্যম সাক্ষরতার গুরুত্ব

ড. মাহাবুবুর রহমান

আমরা বর্তমানে এমন এক জমানায় বসবাস করছি, যখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের যাপিত জীবনের প্রায় সবকিছু নির্ধারণ করে দিচ্ছে। বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনধারা ও ভাষা। বদলে যাওয়ার এ গতি এত দ্রুত হচ্ছে যে ৫০ বছর পর মানবসমাজের গতিপ্রকৃতি ঠিক কেমন হবে, সে সম্পর্কে যোগাযোগ কিংবা সমাজবিজ্ঞানীরা কোনো ধরনের সুস্পষ্ট অনুমিতি করতে পারছেন না। গণমাধ্যমকে বলা হয় মানুষের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজের দর্পণ হিসেবে চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে গণমাধ্যম আমাদের সামনে তুলে ধরে। সমাজের চোখ ও কান হিসেবে সমসাময়িক পৃথিবীতে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গণমাধ্যম একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সময়ের মানুষ হিসেবে আমরা গণমাধ্যম ছাড়া একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না। যে কারণে আলবেয়ার ক্যামু আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কেবল রমণ করছে আর খবরের কাগজ পড়ছে।' এই একটি বাক্যতেই আধুনিক মানুষের ডেফিনেশন শেষ হয়ে যায়। গণমাধ্যমের ওপর আধুনিক মানুষের এই অতি নির্ভরশীলতার কারণেই গণমাধ্যম-গবেষক এবং তাত্ত্বিকরা সমাজের ওপর গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। কারণ উন্নত ও অনুন্নত নির্বিশেষে সমাজের একটি বৃহত্তম অংশের মানুষই গণমাধ্যম-সাক্ষর নয়।

গণমাধ্যমকে আমরা যতই সমাজের দর্পণ বলে এর গুণগান করি না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি যে এ দর্পণে সবসময় সমাজের সঠিক ছবি দেখা না গিয়ে কখনো কখনো বিজ্ঞাপনদাতা, মালিকানা কাঠামো, স্বীয় ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে উল্টো ছবি দেখা যায়। গণমাধ্যমের এই রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে একটি ন্যূনতম সাদামাটা ধারণাও অনেকের না থাকার কারণে গণমাধ্যম প্রচারিত বা প্রকাশিত তথ্য কখনো কখনো মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলে।

পশ্চিমা বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডিতেই টেক্সট বুকে 'মিডিয়া লিটারেসি' নিয়ে আলাপ-আলোচনা থাকলেও আমাদের মতো উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতাবিষয়ক একাডেমিক ডিসিপ্লিনের বাইরে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা খুব একটা চোখে পড়ে না বললেই চলে। যদিও পশ্চিমা পৃথিবীর পাশাপাশি আমাদের গণমাধ্যম ব্যবস্থাও ট্র্যাডিশনাল গণমাধ্যমের পরিসর পার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার বৃহৎ পরিসরে প্রবেশ করেছে।

পৃথিবীর অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থায়ও গত ২০ বছরে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর যে কোনো উন্নত দেশের মতোই বাংলাদেশের মানুষও গণমাধ্যম ছাড়া তাদের প্রাত্যহিক জীবন কল্পনাও করতে পারে না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারের ওপর সনাতন গণমাধ্যমের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার এই প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি বড়ো অংশই কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী, যাদের জীবনযাপনের ওপর সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বলেই গবেষণায় প্রতীয়মান হচ্ছে। যদিও গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের খুব সংখ্যক মানুষই মিডিয়া লিটারেট। দুঃখের বিষয় হলো, যেখানে আমাদের পুরো মানবীয় এবং সামাজিক সম্পর্কই বলতে গেলে গণমাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত, সেখানে সরকারি বা বেসরকারি কোনো পর্যায় থেকেই মানুষকে মিডিয়া লিটারেট করার কোনো উদ্যোগ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের চোখে গোচরীভূত হচ্ছে না। বর্তমান নিবন্ধে অতি সংক্ষেপে মিডিয়া লিটারেসি কী এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্বই বা কতখানি, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো।

মিডিয়া লিটারেসি ধারণা

ডেভিড ব্যাকিংহাম মিডিয়া লিটারেসির তাত্ত্বিক পরিকাঠামো নির্মাণ করেছেন মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি ধারণাকে একীভূত করে। তার মতে, 'গণমাধ্যম পণ্যের উৎপাদন, গণমাধ্যমের আধেয়, উপস্থাপনের ধরন এবং শ্রোতা-দর্শকদের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেই সে ব্যক্তিকে মিডিয়া লিটারেট বলা যায়।

* গণমাধ্যম পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো– প্রযুক্তি, উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মিডিয়ার মালিকানা কাঠামো, ব্যবসায়িক নীতি, গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট আইনকানুন, গণমাধ্যম পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং গণমাধ্যম সমাজের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে ইত্যাদি।
* অন্যদিকে গণমাধ্যমের আধেয়র সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো– গণমাধ্যম প্রবাহিত আধেয়র অর্থ, অডিয়েন্সের কাছে গণমাধ্যম প্রবাহিত আধেয়র গ্রহণযোগ্যতা, গণমাধ্যমের নিজস্ব হাউস স্টাইল, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি ইত্যাদি।
* উপস্থাপনের ধরনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো– বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার নির্মাণ, সত্য প্রকাশের ধরন, কীভাবে একটি সংবাদমূল্যহীন ইস্যু সংবাদ হয়ে ওঠে এবং কীভাবে একটি শক্তিশালী সংবাদমূল্য থাকা ইস্যু মর্গে চলে যায়, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা, বিকল্প মতামত তুলে ধরার প্রয়াস, বিভিন্ন গণমাধ্যমে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনের কারণ, অডিয়েন্সের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে গণমাধ্যমের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।
* অডিয়েন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো– উদ্দিষ্ট শ্রোতা-দর্শক, উদ্দিষ্ট শ্রোতা-দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গি টিকিয়ে রাখতে গণমাধ্যমের প্রচারভঙ্গি, শ্রোতা-দর্শকদের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন, শ্রোতা-দর্শকদের কাছে গণমাধ্যম প্রবাহিত বার্তা কীভাবে গৃহীত হচ্ছে এবং ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক শ্রেণি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে গণমাধ্যম কোন অডিয়েন্সের জন্য কোন ধরনের আধেয় তৈরি করছে ইত্যাদি।

১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া লিটারেসি কমিউনিটি মিডিয়া লিটারেসির একটি সংজ্ঞা প্রদান করে। তাদের মতে, 'গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো গণমাধ্যমের বার্তায় প্রবেশাধিকার, বার্তা বিশ্লেষণের সক্ষমতা, বার্তা মূল্যায়নের দক্ষতা এবং সম্ভাব্য উপায়ে বার্তা উৎপাদনের দক্ষতা।' সাধারণভাবে সাক্ষরতা বলতে আমরা বুঝি লেখা ও পড়ার দক্ষতা। বর্তমানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করছি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের আধেয় বোঝা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা মালিকানা কাঠামোর চরিত্র নির্বিশেষে বিভিন্ন মিডিয়া উপস্থাপিত আধেয়র মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা একজন আদর্শ নাগরিকের আবশ্যকীয় যোগ্যতার মধ্যে পড়ে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। গবেষকদের মতে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা মানুষকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন–

১. ক্রিটিক্যাল চিন্তার উদ্রেক ঘটাতে
২. গণমাধ্যম কীভাবে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ করছে সেটা বুঝতে
৩. গণমাধ্যমের বিপণন কৌশল বুঝতে
৪. গণমাধ্যম কেন কোনো একটি সুর্নিদিষ্ট মত বা পথের পক্ষে কাজ করে তা বুঝতে
৫. গণমাধ্যমের প্রভাবিতকরণের কৌশল বুঝতে
৬. গণমাধ্যমে কেন কোনো ঘটনার উল্টো চিত্র দেখা যায় তা বুঝতে
৭. ঘটনার পেছনের ঘটনা, যা গণমাধ্যম বলতে চায় না বা বলতে পারে না তা বুঝতে
৮. অডিয়েন্সের নিজস্ব বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ অনুযায়ী গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তাকে মূল্যায়ন করতে
৯. বার্তা তৈরি এবং উপস্থাপনের কৌশল জানতে
১০. গণমাধ্যমকে ন্যায়সংগতভাবে সমাজ বাস্তবতা নির্মাণে বাধ্য করতে।

সহজভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো গণমাধ্যম এবং এর আধেয়কে বোঝা। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তা বোঝার ও সেটাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা এবং তাদের মধ্যে মিডিয়ার আধেয় তৈরির জন্য সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি করারই হলো গণমাধ্যম সাক্ষরতা। বিশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে তারা বুঝতে পারবে মিডিয়ায় প্রকাশিত বা প্রচারিত আধেয়টির নির্মাতা কারা, আধেয়টি নির্মাণের উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি কী, নির্মাণ পদ্ধতি কী, আধেয় উপস্থাপনার ধরন কেমন, আধেয় প্রকাশ বা প্রচারের পেছনে কোনো প্রচারণামূলক উদ্দেশ্য আছে কি না কিংবা আধেয়র মধ্যে কোনো পক্ষপাতদুষ্টতা অথবা সেন্সরশিপ আছে কি না। ডেভিড ব্যাকিংহাম মিডিয়া লিটারেসিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

'Media literacy education is sometimes conceptualize as a way to address the negative dimensions of mass media, popular culture and digital media, including media violence, gender and racial stereotypes, the sexualisation of children and concern about loss of privacy , cyber-bullying and internet predators. By building knowledge and competencies in using media and technology, media literacy education may provide a type of protection to children and young people by helping them make good choices in their media consumption habits and patterns of usage.'

এ ছাড়াও গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থাৎ গণমাধ্যমের মালিকানা কাঠামো, ব্যবসায়িক মতাদর্শ, বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক ইত্যাদি গণমাধ্যমের আধেয় নির্মাণ এবং প্রকাশভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সেটাও গণমাধ্যম সাক্ষরতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল হতে পারে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বর্তমান চিত্র

নব্বইয়ের দশকের পর পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থাও চরিত্রগতভাবে বদলাতে থাকে। বিশ্বায়নের ফলে একদিকে যেমন মুক্তবাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে শুরু করে, অন্যদিকে গণমাধ্যম ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিকীকরণের পথে অগ্রসর হতে থাকে। আকাশ সংস্কৃতির দুরন্ত ছোঁয়ায় মুক্তবাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক ও মুক্তগণমাধ্যম ব্যবস্থার বিকাশলাভ করতে শুরু করে বাংলাদেশের মতো দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক পরিমণ্ডলগুলোয়। এরকম বাস্তবতায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণে বেতার টেলিভিশন থাকলেও সরকার বাণিজ্যিকভাবে স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচারের অনুমতি প্রদান করে। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অডিয়েন্সরা হঠাৎ করেই আকাশ সংস্কৃতিবাহিত হয়ে অসংখ্য বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেলের আধেয়র সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে, যারা কিছুদিন আগেও টেলিভিশন অনুষ্ঠান বলতে শুধু বিটিভির অনুষ্ঠানকেই বুঝত।

বর্তমানে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। দেশে বর্তমানে ৩৫টির মতো টেলিভিশন চ্যানেল, ছয়টি এফএম রেডিও চ্যানল ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচার করছে। তিন শতাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও ১২টি কমিউনিটি রেডিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কমিউনিটিভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ গণমাধ্যম জরিপ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ রেডিও শোনে, ৬৭ শতাংশ টেলিভিশন দেখে, ৩৯ শতাংশ পত্রিকা পড়ে এবং ৪৩ শতাংশ মানুষ সিনেমা দেখে। জরিপ থেকে আরও দেখা যায়, ৩৪ শতাংশ মানুষ সপ্তাহে অন্তত একদিন পত্রিকা পড়ে, যদিও পত্রিকা পাঠ এখন পর্যন্ত মোটা দাগে একটি শহুরে অভ্যাসেই সীমাবদ্ধ আছে। গ্রামীণ ১০ শতাংশ সংবাদপত্র পাঠকের বিপরীতে শহরের প্রায় ৪৪ শতাংশ মানুষ পত্রিকা পাঠ করে। ২০১৩ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা যায়, সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ মনে করে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত আধেয় বিশ্বাসযোগ্য এবং ৫৫ শতাংশ মনে করে, দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে।

মার্শাল ম্যাকলুহানের সেই ঐতিহাসিক বিশ্বগ্রাম তত্ত্বকে আজ বাস্তব প্রমাণিত করে বাংলাদেশের মানুষও বিশ্বায়িত গণমাধ্যম ব্যবস্থায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করছে। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করছে এবং প্রতি ১২ সেকেন্ডে বাংলাদেশের একজন নাগরিক ফেসবুকে যুক্ত হচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্মহারের চেয়েও বেশি।

মোটা দাগে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। সুতরাং দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তাকে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার গুরুত্ব

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কিশোর এবং তরুণ শ্রেণি ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভোক্তা। আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে কোনো দূরত্ব তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিডিয়া কনভারজেন্সের মাধ্যমে আজ ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া ধারণ করছে ডিজিটাল মিডিয়ার রূপ। সংবাদপত্র পাঠকরা প্রতি সেকেন্ডেই ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সংবাদ আপডেট পেয়ে যাচ্ছে, টেলিভিশন দর্শকরা স্মার্টফোনে দেখতে পারছে টেলিভিশনের লাইভ কনটেন্ট, উপভোগ করছে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অপর প্রান্ত থেকে ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিও। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে বসে উপভোগ করতে পারছে যে কোনো মানুষ। কেবল দরকার হাতে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি মোবাইল ফোন। বন্ধুত্বের সীমারেখা আজ সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দেশ থেকে দেশান্তরে। ফলে অজপাড়াগাঁয়ের শিশুটি আজ কম্পিউটার গেমিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে পৃথিবীর কোনো উন্নত শহরে বসে কম্পিউটারের মাউসে হাত রাখা আরেক শিশুর সঙ্গে।

এরকম পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম সাক্ষরতা আজ বাংলাদেশে একটি অতি জরুরি বিষয় হিসেবে গণমাধ্যম তাত্ত্বিক ও গবেষকদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ প্রতিনিয়ত অসংখ্য শিশু-কিশোর বাড়িতে-স্কুলে গণমাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, যুক্ত হচ্ছে গণমাধ্যমের প্রভূত আধেয়র সঙ্গে। এই বাস্তবতায় গণমাধ্যমের আধেয় বোঝা এবং আধেয়কে বিশ্লেষণ করে এর ভালো-মন্দ দিকগুলো আলাদা করতে পারার মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই বাংলাদেশে মিডিয়া লিটারেসি একাডেমিক কারিকুলামে যুক্ত করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিককালে মিডিয়া লিটারেসি ধারণার সঙ্গে কার্যকর গণতান্ত্রিক চেতনা ধারণা ও সুনাগরিক চেতনাকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে দেখা হয়। কালর্সন ও অন্যদের মতে, 'বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের ক্রমাগত কনভারজেন্সের ফলে গণমাধ্যম এবং মাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি গণতন্ত্র এবং অংশগ্রহণমূলক নাগরিক চেতনার সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। আজ থেকে ২০ বছর আগে ইউনেস্কো জার্মানির গ্রুনয়োল্ড শহরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এক সভা থেকে গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করে। ওই ঘোষণাপত্রে বলা হয়, বর্তমান সমাজে গণমাধ্যম একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষের গণমাধ্যম সম্পর্কে কার্যকর ও সুবিন্যস্ত জ্ঞান আহরণ করা অত্যন্ত যৌক্তিক হয়ে পড়েছে, যা সুনাগরিক হিসেবে সমাজে ভূমিকা পালনের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে।

দুই দশকে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় কিছু নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো–

* প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে বেতার, টিভি, ইন্টারনেট, সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে এবং মিডিয়া কনভারজেন্সের মাধ্যমে এসব মিডিয়াকে আমরা আজ অনলাইন প্লাটফর্মে একীভূতভাবে পাচ্ছি। ফলে গণমাধ্যমের আধেয় উৎপাদনে যেমন বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা এসেছে, তেমনি মানুষের সামনে বৈচিত্র্যপূর্ণ গণমাধ্যম পণ্য থেকে নিজের পছন্দ উপযোগী পণ্য নির্বাচনের সুযোগও এসেছে।
* অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে গণমাধ্যমের সঙ্গে বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে এবং দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ গণমাধ্যম বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে গণমাধ্যম সমাজে একটি ভোক্তা সংস্কৃতি নির্মাণে সদা তৎপর এবং সে লক্ষ্যে জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বহুজাতিক করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষা করছে গণমাধ্যম। বাণিজ্যিক গণমাধ্যমের চাপে বিকল্প মতামত গণমাধ্যমের দর্পণে উঠে আসছে না। ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কে বহুজাতিক করপোরেশনকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগও ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে আসছে।
* প্রাযুক্তিক ও সামাজিক উন্নয়নের ফলে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে প্রকটভাবে। সামাজিক মাধ্যমের কোমল ছোঁয়ায় মানুষের লোকপরিসরেও এসেছে পরিবর্তন। একসময়ের যূথবদ্ধ সামাজিক চেতনার পরিবর্তে মানুষ ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। যৌথ পরিবারের ধারণা ভেঙে গিয়ে একক পরিবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে মানুষ। পুঁজিবাদের ঘেরাটোপে আটকা পড়ছে মানুষ গণমাধ্যমবাহিত ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়ে।
* বিশ্বায়নের ফলে পরাজাতিক পুঁজিবাদ পণ্যায়িত পশ্চিমা সংস্কৃতি নির্মাণ করছে মিডিয়ার কল্যাণে। স্থানিক আর আন্তর্জাতিকের ব্যবধান মুছে যাচ্ছে বিশ্বায়িত মিডিয়ার কোমল পরশে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া করপোরেশনগুলো কমবেশি প্রায় সব মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বায়নের বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক হারে প্রবেশের মাধ্যমে সেখান থেকে পুঁজি আহরণ, বিনিয়োগ ইত্যাদির জন্য তাদের দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব-বাণিজ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো এবং তাদের অনুগত সংস্থাগুলো। তাদের যুক্তি হলো, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক মুক্তি বিশ্বায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সবকিছুকে অর্থাৎ যা কিছু মানবীয়, তার সবকিছুর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা এই সময়ের মানুষ বিশ্বায়নের ভেতর দিয়েই চলছি। বিশ্বায়ন আমাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। সবকিছুকে এই যে বিশ্বায়িত বা ভুবনীকরণ করে ফেলা, এটাই সমকালীন বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা চাই বা না চাই, আমরা করি বা না করি, মানবীয় সব ক্রিয়াকর্ম এমনই হয়ে উঠছে যে মানুষের ভুবনীকরণ ঘটে যাচ্ছে, ঘটিয়ে ফেলা হচ্ছে। আর বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাও এর থেকে মুক্ত নয়। ফলে সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্যও বাড়ছে প্রকটভাবে।

এরকম বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সুনাগরিক চেতনার মিশেল ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর আগামী প্রজন্ম তৈরি করতে হলে আমাদের তরুণ শ্রেণিকে গণমাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করার কোনো বিকল্প নেই। কারণ বর্তমানে মিডিয়াই আমাদের যাপিত জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সমাজে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, তা আমরা মিডিয়াপ্রবাহিত বার্তার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। বৈশ্বিক গণমাধ্যমের বাণিজ্যিক চরিত্রের কারণে স্থানিক আর আন্তর্জাতিক তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দূরত্বের ভেদরেখা টানা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছে। সামাজিক ও গণমাধ্যম গবেষণায় উঠে এসেছে যে, শিশু-কিশোর ও তরুণ শ্রেণি মূলত মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশি। অভিভাবকরা চাইলেই সন্তানদের মিডিয়ার প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত রাখতে পারছেন না। সামাজিক গণমাধ্যম কতটা আশীর্বাদ আর অভিশাপ, সেটা নিয়ে তর্ক চলছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ও সামাজিক গণমাধ্যমবাহিত হয়ে প্রবাহিত নেতিবাচক বার্তা যেন আমাদের আগামী প্রজন্মকে কলুষিত করতে না পারে, সেজন্য তাদের গণমাধ্যম-সাক্ষর হিসেবে গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। গণমাধ্যমনির্ভর পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে এবং পরিবর্তিত পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, তারা যেন গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তা কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই না করে তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোয় যেখানে অধিকাংশ মানুষ এখনো শিক্ষাবঞ্চিত, সেখানে গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তা থেকে কোনটি প্রচার আর কোনটি প্রপাগান্ডা, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি কার্যকর ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে একদিকে যেমন সব মানুষের গণমাধ্যমে সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে গণমাধ্যমপ্রবাহিত বার্তা যেন তাদের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে কিংবা তারা যেন গণমাধ্যমের নেতিবাচক উপস্থাপনের বলি না হয়, সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে জাতীয় কারিকুলামে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। আর এভাবেই আজকের নতুন প্রজন্ম জটিল, বিচ্ছিন্ন ও বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন সুনাগরিক হিসেবে তার ওপর অর্পিত মানবীয় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গণমাধ্যমের প্রভাব-বলয় থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। তাই গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার একমাত্র পথ গণমাধ্যম সাক্ষর হয়ে ওঠা।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে বিচরণে দরকার গণমাধ্যম সাক্ষরতা

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

বিশ্বগ্রাম ধারণা আরও ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। কারণ ইন্টারনেটের বিস্তার আর মোবাইল ফোনের ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। কিপ্যাড/কিবোর্ডে চাপ দিলে অথবা টাচস্ক্রিনে ছোট্ট একটু স্পর্শেই একঝলকে পর্দায় ভেসে উঠছে ছবি ও তথ্য। এ কারণে তথ্যের এই অবাধ প্রবাহের যুগে গণমাধ্যমের প্রভাবকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। গত শতকের রেডিও কিংবা টেলিভিশন ও হালের ফেসবুক, ইউটিউব কিংবা টুইটারসহ সব ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহারের অবারিত সুযোগ মানুষের সামনে খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। কিন্তু এ পথ একেবারে বিপদমুক্ত নয়, বরং এর অপব্যবহারে বিপথে যাওয়ার দ্বারও খোলা আছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা ও গণমাধ্যম সংক্রান্ত সাক্ষরতা।

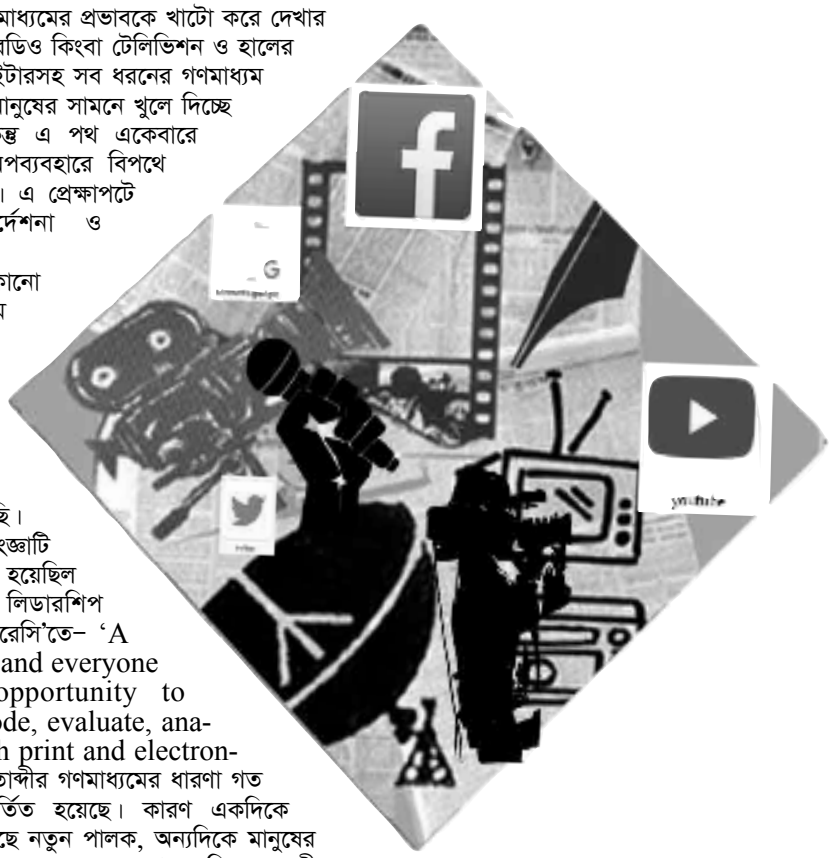

গণমাধ্যম সাক্ষরতা কোনো একটি বিশেষ মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কারণে গণমাধ্যম সাক্ষরতার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য আমরা তাত্ত্বিকদের মধ্যে ভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা লক্ষ করেছি। গণমাধ্যম সাক্ষরতার যে সংজ্ঞাটি বহুল উদ্ধৃত, সেটি দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে 'ন্যাশনাল লিডারশিপ কনফারেন্স অন মিডিয়া লিটারেসি'তে– 'A media literate person and everyone should have the opportunity to become one can decode, evaluate, analyze and produce both print and electronic media.' কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গণমাধ্যমের ধারণা গত তিন দশকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ একদিকে গণমাধ্যমের ধরনে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক, অন্যদিকে মানুষের গণমাধ্যম ব্যবহারের মাত্রাও বেড়েছে। সে কারণে একবিংশ শতাব্দীতে এসে গণমাধ্যম সাক্ষরতার আরও বলিষ্ঠ একটি সংজ্ঞা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া লিটারেসি

এডুকেশনের মতে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো শিক্ষার প্রতি একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমানে সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম (মুদ্রণ থেকে শুরু করে ইন্টারনেট) ব্যবহার, ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন করার সক্ষমতা এবং বার্তা তৈরির দক্ষতাই হলো গণমাধ্যম সাক্ষরতা– *It provides a framework to access, analyze, evaluate, create and participate with messages in a variety of forms— from print to video to the Internet*. সব ধরনের যোগাযোগমাধ্যম বলতে মুদ্রণমাধ্যম থেকে শুরু করে হাল আমলের অনলাইন মাধ্যমকে বোঝানো হয়েছে। কানাডায় সরকারিভাবে গণমাধ্যম সাক্ষরতার স্বীকৃত সংজ্ঞা হলো:

> *Media Literacy is concerned with helping students develop an informed and critical understanding of the nature of mass media, the techniques used by them and the impact of these techniques. More specifically, it is education that aims to increase students' understanding and enjoyment of how the media work, how they produce meaning, how they are organized, and how they construct reality. Media literacy also aims to provide students with the ability to create media products.*

গণমাধ্যম সাক্ষরতার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম থেকে যেসব বার্তা পায়, সেগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। গণমাধ্যম কীভাবে মানুষের অনুধাবন ও বিশ্বাসগুলোকে ফিল্টার করে, কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতির রূপ দেয় এবং তাদের ব্যক্তিগত পছন্দগুলোকে প্রভাবিত করে, তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে গণমাধ্যম সাক্ষরতা। গণমাধ্যমের যৌক্তিক ব্যবহারকারী ও তথ্য উৎপাদনকারী হতে হলে ক্রিটিক্যাল (জটিল ও গঠনমূলক) চিন্তন ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সৃজনশীল দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শুধু মানুষকে ক্রিটিক্যাল (গঠনমূলক ও জটিল) চিন্তাভাবনার সক্ষমতাই দেয় না বরং এর মাধ্যমে সৃজনশীল বার্তা তৈরির দক্ষতাও অর্জন করে। Sonia Livingstone বলছেন, গণমাধ্যম সাক্ষরতার ধারণাটি চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো: গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ, বার্তা বিশ্লেষণ দক্ষতা, মূল্যায়ন ক্ষমতা ও বার্তা তৈরির সক্ষমতা। এ কারণে ইউনেস্কো গণমাধ্যম সাক্ষরতার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে সৃজনশীল বার্তা তৈরির দক্ষতা এবং সমাজের সার্বিক দিকের ওপর এর প্রভাবকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে–

> *A composite set of knowledge, attitudes and skills, necessary to access, analyse, evaluate, use, produce and communicate information, media content and knowledge in creative, responsible and ethical ways in order to participate and engage in personal, professional and societal activities.*

ইংরেজি ভাষাভাষী জাতিগুলোর মধ্যে অনেককেই 'গণমাধ্যম সাক্ষরতা' ও 'গণমাধ্যম শিক্ষা' পদবন্ধগুলোকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যুক্তরাজ্যে 'গণমাধ্যম শিক্ষা' বলতে গণমাধ্যম সম্পর্কিত শিক্ষা ও বিদ্যার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। গণমাধ্যম, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল এবং সৃজনশীল সক্ষমতা বাড়ানোই এ ধরনের শিক্ষার লক্ষ্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে অনেকে আবার মনে করেন, গণমাধ্যম শিক্ষা হলো প্রক্রিয়া আর গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো ফলাফল বা প্রাপ্তি। তবে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তি বা মাধ্যমের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই।

গণমাধ্যম সাক্ষরতার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই একটি তদন্তভিত্তিক শিক্ষাদান মডেল (inquiry-based pedagogic model) ব্যবহৃত হয়, যা মানুষ প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের সাহায্যে যা দেখছে, শুনছে কিংবা পড়ছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক শিক্ষা শুধু গণমাধ্যমের বার্তা ক্রিটিক্যালি (জটিল ও গঠনমলূক) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে না, বরং এটি গণমাধ্যম ব্যবহারের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং মানুষকে তার নিজস্ব বার্তা তৈরির ক্ষেত্রে সৃজনশীল দক্ষতা বাড়ায়। ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণের মধ্যে বার্তার রচয়িতা, রচয়িতার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিতকরণ, বার্তার গঠনকাঠামো ও বৈশিষ্ট্য যাচাই করা, গণমাধ্যমের উপস্থাপনের ধরন ও কাঠামো নিরীক্ষা করা এবং সংবাদ কিংবা অনুষ্ঠানে প্রচারণা, সেন্সরশিপ ও পক্ষপাতিত্ব নির্ধারণের কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্ত। এমনকি গণমাধ্যমের মালিকানা ও এর অর্থায়ন ইত্যাদি দূরবর্তী বিষয়গুলো সম্পর্কে গণমাধ্যম সাক্ষরতা মানুষকে জ্ঞান দিয়ে থাকে।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে গণমাধ্যম সাক্ষরতাকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা হয়। এক. ক্ষমতায়ন (Empowerment) দৃষ্টিভঙ্গি, দুই. সুরক্ষাবাদী (Protectionist) দৃষ্টিভঙ্গি। গণমাধ্যম সাক্ষরতার তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা ধরনের মত আমরা পাই। David Buckingham, যাকে আধুনিক সুরক্ষাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা বলা হয়, তিনি প্রচলিত ও আধুনিক সব ধরনের গণমাধ্যমের সাক্ষরতার জন্য চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন: উৎপাদন, ভাষা, উপস্থাপন ও দর্শক-শ্রোতা। সুরক্ষাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের অন্যতম হলেন W. James Potter। তাঁর মতে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা আমাদের গণমাধ্যমের বার্তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়– 'Media literacy is a set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the mass media to interpret the meaning of the messages we encounter.' অন্যদিকে ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন Henry Jenkins ও Renee Hobbs. Renee Hobbs শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতাকে পরিচিতকরণের জন্য তিনটি কাঠামোর কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– লেখক/রচয়িতা ও দর্শক/শ্রোতা (Authors and Audiences-AA), বার্তা ও অর্থ (Messages and Meanings-MM) এবং উপস্থাপন ও বাস্তবতা (Representation and Reality-RR)।

যেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোয় এখন একটি অনস্বীকার্য বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু দেশের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে একটা জাতি কতটা আধুনিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক তার পরিমাপ হয় দেশটির গণমাধ্যম সাক্ষরতার তত্ত্বীয় পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে। উন্নত দেশগুলোয় গত ত্রিশ বছরে জ্ঞানচর্চার জগতে গণমাধ্যম শিক্ষা ও গণমাধ্যম সাক্ষরতা আলাদা গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। সে হিসাবে আমাদের দেশে এর চর্চা শুরুই হয়নি এখনও। অথচ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের চেয়ে নতুন নতুন গণমাধ্যম ব্যবহারকারীর হার আমাদের দেশে অনেক বেশি। বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও এর ব্যবহারকারীর সংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারি নথিভুক্ত পত্রিকার সংখ্যা ৬৬৭টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ৩৩১টি। ৫১৭টি দৈনিকের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২২৫টি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৪১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি বেসরকারি রেডিও চ্যানেল এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিওর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৬৪ লাখ ৬৯ হাজার। প্রতি মাসেই মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে দেশে। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। সবশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ২৪ লাখ ৬৬ হাজার, যা বছরের শুরুতে ছিল ৮ কোটি ৮ লাখ ২৯ হাজার। উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৬ লাখ ৫২ হাজার। এই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ আবার সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারকারী। গত কয়েক বছরে দ্রুতগতিতে বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। ২০১৬ সালের জুলাই পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৪ লাখ ৩৯ হাজার। সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রতি ১২ সেকেন্ডে বাংলাদেশে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী বাড়ছে, যা দেশটির

জন্মহারের চেয়ে বেশি। বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারী শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা দ্বিতীয়।

প্রচলিত গণমাধ্যম পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের পাশাপাশি নতুন নতুন মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তরুণরা বেশ এগিয়ে। সম্প্রতি ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (সাকমিড) পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৮০.৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ইন্টারনেটসহ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। তাদের সংবাদ গ্রহণ করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেসবুক ৩২.৩ শতাংশ, ইউটিউব ২২.৬ শতাংশ, সংবাদপত্র ৩৫.৪ শতাংশ, টেলিভিশন ৪৯.৫ শতাংশ, রেডিও ৬.৪ শতাংশ, অনলাইন পোর্টাল ১৯ শতাংশ এবং অন্যের মুখ থেকে শোনা ৩৮.৭ শতাংশ। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭২ ভাগ শিক্ষার্থীর ফেসবুক এবং ৪৭.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে।

অর্থাৎ আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী প্রচলিত গণমাধ্যমের পাশাপাশি ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে অবাধে প্রবেশ করছে। এসব গণমাধ্যম থেকে প্রতিদিন নিজেরা যেমন বার্তা পাচ্ছে, তেমনি বার্তা প্রকাশ বা প্রচার করছে। বিশ্বজুড়ে কিশোর-কিশোরীরা তাদের অগণিত সময় গণমাধ্যমের পেছনে ব্যয় করছে। একজন কিশোর-কিশোরী স্কুলে শিক্ষকের সঙ্গে যত সময় কাটায়, তার চেয়ে ঢের বেশি সময় কাটায় মোবাইল নিয়ে কিংবা টেলিভিশনের সামনে অথবা ভিডিও গেমস নিয়ে ব্যস্ত থাকার মধ্য দিয়ে। কিশোর-কিশোরী কিংবা তরুণদের যাপিত জীবনের নিয়ত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, মিডিয়া তাদের জীবনে কতটা প্রভাব রাখে।

ইন্টারনেটসহ যে কোনো গণমাধ্যমের সুবাদে প্রাপ্ত তথ্য ও সংবাদ কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর সুফল আমরা পেতে পারি এবং কীভাবে এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি, তা নিয়ে সজাগ করার শিক্ষাটাই গণমাধ্যম সাক্ষরতা। বর্তমান যুগের বাস্তবতায় গণমাধ্যমের সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তাকে সাঁতার শেখার আবশ্যিকতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমাদের কাছে প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইট দুনিয়া এখন উন্মুক্ত। ফলে অন্তর্জাল ও টেলিভিশনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের দশদিকের জানালা খুলে গেছে। একটা সময় বিটিভিই ছিল একমাত্র ভরসা। অথচ কুয়োর ব্যাঙ বিটিভি থেকে এখন আমরা ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে পড়ে গেলাম। সাঁতার শেখা হয়নি বলে ডুবে মরার আশঙ্কা ভয়াবহ। এ সাঁতার জানাটাই গণমাধ্যম সাক্ষরতা।

শিশু ও তরুণদের জন্য গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক. গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দুই. গণমাধ্যমের ব্যবহার ও বার্তা তৈরির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরি করা। শিশু এবং তরুণরা এখন সাদামাটাভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করছে। একদিকে যেমন তারা গণমাধ্যম থেকে বার্তা নিচ্ছে, অন্যদিকে গণমাধ্যমে বার্তাও দিচ্ছে। কিন্তু এভাবে সাদামাটাভাবে বার্তা আদান-প্রদান গণমাধ্যম সাক্ষরতার লক্ষ্য নয়। বরং সৃজনশীল ও ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণমাধ্যম ব্যবহারের সক্ষমতা তৈরি করাই হলো এ ধরনের সাক্ষরতার মূল উদ্দেশ্য। যেসব বার্তা শিশু ও তরুণদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং কীভাবে সফল যোগাযোগ করবে, তা শেখানো গণমাধ্যম সাক্ষরতার মূল উপজীব্য। গণমাধ্যম সাক্ষরতা যেসব বিষয়ে সাহায্য করে সেগুলো হলো:

* ক্রিটিক্যাল (জটিল ও গঠনমূলক) চিন্তাভাবনাকে সাহায্য করে;
* গণমাধ্যমের আধেয় কীভাবে সংস্কৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে, তা বুঝতে সাহায্য করে;
* বিপণন ও যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে;
* গণমাধ্যমের আধেয়ের উৎপাদনকারী উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যায়;
* প্রভাবন কৌশল নির্ধারণ করা যায়;
* মিথ্যা তথ্য, বিকৃতি ও আনুগত্য চিহ্নিত করা যায়;
* নিজস্ব আধেয় প্রস্তুত ও শেয়ার করা যায়;
* সক্রিয় নাগরিক হিসেবে জনপরিসরে অংশগ্রহণ করা যায়।

আমাদের মতো যেসব উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না, সেসব দেশে পাঠক/দর্শকের প্রতি গণমাধ্যমের জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। পাঠক, দর্শকের গণমাধ্যম সাক্ষরতার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো সস্তা বিনোদন ও নিজস্ব মতাদর্শের তথ্য হরহামেশাই প্রচার/প্রকাশ করে যাচ্ছে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা থাকলে পাঠক, দর্শকরা বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের কাছ থেকে গ্রহণ প্রক্রিয়াটি আত্মস্থ করতে পারতেন। এখন যা হচ্ছে তা একমুখী– গণমাধ্যম কুশীলবরা বার্তা তৈরি করছেন আর দর্শকদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ দর্শক তা নিতে না পেরে হচ্ছেন বিদেশি মাধ্যমমুখী কিংবা সামাজিক গণমাধ্যমনির্ভর। ফলে তথ্যের বিকৃতি ঘটছে, ছড়াচ্ছে গুজব। সমাজে দেখা দিচ্ছে অসন্তোষ। গণমাধ্যম সাক্ষরতার অভাব যে কত প্রকট, তা ফুটে ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত পোস্ট ও কমেন্টগুলোয়। ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তাসকিন আহমেদের পুত্রসন্তান জন্ম নিয়ে (মাসুদ, ২০১৮) যে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বার্তা সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়ানো হয়, তাতে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠে। উপরন্তু গণমাধ্যম সাক্ষরতার অজ্ঞতায় গত কয়েক মাসে সামাজিক গণমাধ্যমে ফেক নিউজের বিস্তারের বিষয়টি নতুন করে ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

গণমাধ্যমবিষয়ক শিক্ষা শুধু গণমাধ্যমের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষকে সম্যক ধারণা দেয় না, গণমাধ্যমের সাহায্যে বার্তা প্রচারের সময় সমাজের প্রতি ব্যক্তির যে দায়িত্ব, সে সম্পর্কেও অবহিত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে গণমাধ্যম সাক্ষরতা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে– 'Scholars and educators have began to discuss media literacy as the ability not just to read texts but also to situate them in relation to broader social, cultural, and political contexts.' উপরন্তু গণমাধ্যমবিষয়ক শিক্ষা বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অংশ, বাক্‌স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য এটি জরুরি। গণমাধ্যম সাক্ষরতা মানুষকে তার নিজস্ব মতামত সুচিন্তিত উপায়ে তুলে ধরতে সাহায্য করে, যা বৃহত্তর পরিসরে সমাজকে প্রভাবিত করে। কারণ মানুষ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্রুতগতিতে ও বিস্তৃত উপায়ে নিজের মত জনপরিসরে তুলে ধরতে পারে। ফলে তার বার্তা জনপরিসরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে দরকার গণমাধ্যম সাক্ষরতা। এক্ষেত্রে –এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য–

> *When people have digital and media literacy competencies, they recognize personal, corporate and political agendas and are empowered to speak out on behalf of the missing voices and omitted perspectives in our communities. By identifying and attempting to solve problems, people use their powerful voices and their rights under the law to improve the world around them.*

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাগুলো থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা সাম্প্রতিক সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কারণ এর অজ্ঞতায় শুধু ব্যক্তি নন, বরং পরিবার, সমাজ ও দেশ, এমনকি গোটা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু গণমাধ্যম সাক্ষরদান অক্ষরজ্ঞানদানের মতো চট-জলদি সম্ভব নয়। এ কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এর চর্চা করতে হবে। উন্নত দেশগুলোয় যেমনটা এরই মধ্যে এর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকেই একে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ কাজে যত দেরি হবে, গণমাধ্যম বিস্ফোরণের কালো দিকগুলো ততই সমাজ ও রাষ্ট্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র

1. Aufderheide, P. (1992). *MEDIA LITERACY: A Report of The National Leadership Conference on Media Literacy.* Queenstown, Maryland: The Aspen Institute.
2. BTRC. (2018a, October 30). *Internet Subscribers*. Retrieved December 25, 2018, from Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission: http://www.btrc.gov.bd/content/internet-subscribers-bangladesh-october-2018

3. BTRC. (2018, October 30). *Mobile Phone Subscribers*. Retrieved December 25, 2018, from Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission: http://www.btrc.gov.bd/content/mobile-phone-subscribers-bangladesh-october-2018
4. Buckingham, D. (2007). *Media education : literacy, learning and contemporary culture* (Reprinted ed.). Cambridge: Polity Press.
5. Center for Media Literacy. (2018). *Media Literacy: A Definition and More*. Retrieved December 24, 2018, from CML: Center for Media Literacy: https://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more
6. Department of Films & Publications . (2018, December 02). *Newspaper circulation number and advertisement rates*. Retrieved December 25, 2018, from Department of Films & Publications : http://www.dfp.gov.bd/site/page/6469f3ce-a47b-453f-84e6-c60e3732bae5/%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0 %A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6% A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA% E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E
7. Duncan, B. (1989). *Media literacy resource guide.* Toronto. ON. Canada: Ontario Ministry of Education.
8. Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action.* Washington, D.C.: The Aspen Institute Communications and Society Program.
9. Hobbs, R. (2006). Multiple visions of multimedia literacy: Emerging areas of synthesis. In M. McKenna, L. Labbo, R. Kieffer, & D. Reinking (Eds.), *Handbook of literacy and technology* (Vol. II). Mahwah: International Reading Association.
10. Internet Live Stats. (2016, October). *Internet Users by Country*. Retrieved December 26, 2018, from Internet Live Stats: http://www.internetlivestats.com/interenet-users-by-country/
11. Jenkins, H. (2007). Media Literacy?Who Needs It? *Children's learning in a digital world* , 15-39.
12. Livingstone, S. (2004). What is media literacy? *Inter media , 32* (3), 18-20.
13. McLuhan, M., MCLUHAN, M., & Lapham, L. H. (1994). *Understanding media: The extensions of man.* MIT press.
14. Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American Behavioral Scientist , 57* (11), 1611-1622.
15. Ministry of Information. (2018, Decemeber 02). *List of Media*. Retrieved December 25, 2018, from Ministry of Information: https://moi.gov.bd/
16. Murad, M. (2017, April 15). *Dhaka ranked second in number of active Facebook users*. Retrieved December 26, 2018, from bdnews24.com: https://bdnews24.com/bangladesh/2017/04/15/dhaka-ranked-second-in-number-of-active-facebook-users
17. Potter, J. W. (2010). The State of Media Literacy. *Journal of Broadcasting & Electronic Media , 54* (4), 675–696.
18. Potter, W. J. (2004). *Theory of media literacy: A cognitive approach.* Sage Publications.
19. South Asia Center for Media in Development. (2018). *Baseline Survey Report on Media Literacy at Secondary Level Schools, June 2018.* Dhaka: South Asia Center for Media in Development.
20. The Daily Asian Age. (2017, February 02). *Social media trends usages in Bangladesh*. Retrieved December 26, 2018, from The Daily Asian Age: http://www.dailyasian-age.com/news/46958/social-media-trends-usages-in-bangladesh
21. UNESCO. (2018, October). *Assessment Framework for Media and Information Literacy launched by UNESCO*. Retrieved December 26, 2018, from UNESCO: https://en.unesco.org/news/assessment-framework-media-and-information-literacy-launched-unesco
22. মাসুদ, র. (২০১৮, অক্টোবর ০২). 'একটা ভালো মুহূর্তেও যারা এমন মন্তব্য করেন, তাদের মানসিকতা কেমন?' স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে মন্তব্যে মর্মাহত বাংলাদেশের ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদের প্রশ্ন. Retrieved ডিসেম্বর ২৬, ২০১৮, from বিবিসি বাংলা:

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম সাক্ষরতা
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মামুন অর রশিদ

বর্তমানে আমরা তথ্যযুগের মহাসমুদ্রে বাস করছি। প্রতিদিনই হাজার রকমের তথ্য আমাদের চারপাশে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমসহ নানা মাধ্যম থেকে আমরা এসব তথ্য পাচ্ছি। যদিও মিথ্যা, ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে আমাদের চারপাশ ছেয়ে যাচ্ছে। একটি প্রবাদ রয়েছে: A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. ভুল তথ্যের জালে আটকা পড়ে আমরা প্রতিদিন মুখোমুখি হচ্ছি নানা ধরনের ক্ষতির। রাজনৈতিক দলগুলো ভুল তথ্য দিয়ে আমাদের বোকা বানাচ্ছে। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ফেলে ঠকিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে হাজারো তরুণকে বিপথগামী করে দেশ-জাতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। fake news বা ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধ এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। যদিও ফেসবুক এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়েবসাইট মিথ্যা তথ্য ছাঁটাই করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে জালপত্রের ক্রমাগত বিস্তার অনিবার্য। সত্যি কথা বলতে, ইন্টারনেটের ওপর পুরোপুরি আমাদের নির্ভর করলে চলবে না। বরং এর পরিবর্তে নাগরিকদের শিক্ষিত এবং ভুয়া বা মিথ্যা অথবা গুজবমূলক তথ্য যাচাই বা এর সত্যতা শনাক্ত করতে শিখতে হবে; তথা মানুষের মিডিয়া লিটারেসি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। তবেই এর থেকে পরিত্রাণ, নচেৎ নহে।

কিছুদিন আগে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের সামনে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল, তখন রাস্তায় একজনের দেহ পড়েছিল। সেখানে পুলিশ ছাড়াও জটলা বেঁধেছিল ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের। তখন মৃতদেহটির পাশ দিয়ে ফোনে কথা বলতে বলতে হিজাব পরিহিত একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে। রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটি যেন তার অভিব্যক্তিকে নাড়া দেয়নি, যা তার নির্বিকারভাবে

হেঁটে যাওয়ার স্টাইলেই ফুটে উঠেছিল। এই দৃশ্যটি ধরা পড়ে অপেশাদার ক্যামেরাম্যানদের ক্যামেরায়। মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায় অনলাইনের সামাজিক মাধ্যমগুলোয়। মুহূর্তেই হিজাব পরিহিত মেয়েটি হয়ে উঠেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি, যার অনুভূতিতে 'লাশ ও রক্ত' কোনো দাগ কাটে না। সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি ও প্রচারণাটি ভাইরাল হয়ে একধরনের হিংসাত্মক বার্তা পৌঁছে দেয় সারা বিশ্বে, যার প্রতিক্রিয়াটি হয় আরও ভয়াবহ এবং রূপ নেয় প্রচ্ছন্ন বর্ণবাদী দাঙ্গায়। অথচ মূল ঘটনাটি ছিল ভিন্ন। জঙ্গি হামলার ঘটনায় হতবিহ্বল মেয়েটি ভয় পেয়ে কানে ফোন রেখে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনিও জড়ো হওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতে থাকেন রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষটিকে।

যুক্তরাজ্যের মেইনস্ট্রিমের মিডিয়াগুলো ত্বরিতগতিতে অনলাইনে মেয়েটির অবস্থান ও প্রতিটি মুহূর্তে তার কার্যকলাপ প্রচার করতে থাকে সঙ্গে সঙ্গেই। সেই সঙ্গে এর আগে ভাইরাল হওয়া ছবিটির যে মেসেজ, তা অকার্যকর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ব্রিটেন রক্ষা পায় সমূহ বর্ণবাদী দাঙ্গা থেকে। অন্যদিকে সুইডেনের রিফিউজি ক্যাম্পে এক ধর্ষণের ঘটনা সেদেশের মেইনস্ট্রিমের মিডিয়াগুলো সম্মিলিত সিদ্ধান্তে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ মিডিয়া লিটারেসির কারণে সুইডেনের শক্তিশালী উগ্র ডানপন্থিদের হাতে কোনোভাবেই বর্ণবাদের মারণাস্ত্র তুলে দিতে চায়নি মিডিয়াগুলো। বর্তমান যুগে একটা জাতি কতটা আধুনিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক, তার পরিমাপ হয় দেশটির 'ডিজিটাল লিটারেসি' ও 'মিডিয়া লিটারেসির' তাত্ত্বীয় পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই এ দুটির হার প্রায় শতভাগ। ওই উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, একটি দেশের মানুষের মধ্যে মিডিয়া লিটারেসি সম্পর্কে ধারণা থাকা কতটা জরুরি।

মিডিয়া লিটারেসি কী

মিডিয়া লিটারেসি একটি পরিভাষা। এখানে দুটি শব্দবন্ধ রয়েছে। একটি হলো Media তথা মাধ্যম আর অন্যটি হলো Literacy তথা সাক্ষরতা।

অর্থাৎ মাধ্যম বলতে বোঝায়, যোগাযোগীয় এমন একটি প্লাটফর্ম, যার দ্বারা একটি বিপুল সংখ্যক দর্শক বা শ্রোতার কাছে তথ্য এবং বিনোদন পৌঁছে দেয়। যেমন– সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইত্যাদি। (A way of communicating information or providing entertainment to larger groups of people. Media can include TV, internet, newspapers, megazines, social media, and news portal and so on.)

আর সাক্ষরতা বলতে বোঝায় কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা বা বোঝার ক্ষমতাকে। (knowledge, understand or skill in a specific area.)

সুতারং মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া সাক্ষরতা বলতে বোঝায়, বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া থেকে পাওয়া বার্তা বা তথ্যগুলো পাওয়া মাত্রই বিশ্বাস না করে সেটি সত্য না মিথ্যা, তা যাচাইয়ের সক্ষমতা অর্জন করা। (The ablity to critically evaluate the various messages we receive from different forms of media.)

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক National Association for Media Literacy Education মিডিয়া লিটারেসিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে, 'It as a series of communication competencies with the ability to access, analyze, evaluate, and communicate in a variety of forms which can be print or non-print messages. They find that media literacy allows people to be critical thinkers and creative in many messages like image, language, and sound.'

দর্শক-শ্রোতা বা পাঠকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান বা দখলের ওপর নির্ভর করে তাদের মিডিয়া লিটারেসি।

১. মিডিয়ায় প্রবেশের সক্ষমতা (Accessing media)
২. মিডিয়া প্রদত্ত আধেয় তথা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষমতা (Analyzing content)
৩. মিডিয়ার বার্তা মূল্যায়ন করতে সক্ষম (Being able to evaluate messages)
৪. নিজেকে প্রকাশ এবং যোগাযোগের জন্য মিডিয়াকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে বা তৈরি করতে পারা। (Being able to create media for self-expression and communication.)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বার্তা বা তথ্য পেলেই সেগুলোর সঠিক যাচাই-বাছাই করে বিশ্বাস করা এবং তারপর সেটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং মিডিয়া প্রদত্ত সব আধেয় পাওয়া মাত্রই সেটার মূল্যায়ন তথা বিশ্লেষণ সক্ষমতাকেই মিডিয়া লিটারেসি বোঝানো হয়।

বিভিন্ন মাধ্যমে ভুয়া খবর ও প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে ভুয়া খবরের কারণে বেশ কয়েকটি বড়ো ধরনের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে– রামুর বৌদ্ধ মঠে ভাঙচুর, শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে হতাহতের সংখ্যা, নাসিরনগরের হিন্দু মন্দিরে হামলা এবং সবশেষ ঝিগাতলায় নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে হত্যা ও ধর্ষণের গুজব ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা।

ঘটনা-১

২০১২ সালে কক্সবাজার জেলার রামুতে এক বড়ুয়া যুবকের ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে রামুর বৌদ্ধপল্লিতে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং শতবর্ষী বৌদ্ধমন্দির, বিহার ও বৌদ্ধমূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনা-২

২০১৩ সালের ৩ মার্চ চাঁদে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর প্রতিকৃতি দেখা গেছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে সারা দেশে ব্যাপক তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয়, যাতে প্রাণহানিও ঘটে। শুধু মিথ্যা গুজবের ওপর ভিত্তি করে এরকম ঘটনা ঘটে।

ঘটনা-৩

২০১৫ সালের ২২ জুন ঢাকায় খেলা দেখতে আসা এক ভারতীয় সমর্থকের ওপর হামলার ভুয়া খবর প্রকাশ করে কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার লিখেছে, বাংলাদেশের একদল সমর্থক ভারতের ওই সমর্থকের ওপর হামলা চালিয়েছিল। তার অটোরিকশা লক্ষ করে পাথরও ছোড়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট দল ও শচীন টেন্ডুলকারের জন্য জীবন উৎসর্গের ঘোষণা দেওয়া সুধীরের ঘটনাটিকে 'হামলা' বলে ভারতের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে। হামলা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের ভাষ্য মতে, ভারতীয় সমর্থকের ওপর হামলা তো দূরে থাক, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। অথচ যাচাই না করেই ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো এমন একটি নেতিবাচক খবর প্রকাশ করে।

ঘটনা-৪

২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার হিন্দু সম্প্রদায়ের এক জেলে যুবকের অবমাননাকর ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে যে হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, এর ফলে বলি হয়েছিল কত প্রাণ, কত পরিবারের সম্পদ, ভীতিকর জীবন কেটেছে কতজনের। অথচ কথিত সেই যুবকের কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্টই ছিল না। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরও তার মুক্তি অনেক কষ্টকর হয়েছিল।

ঘটনা-৫

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় ২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বর ফেসবুকে এক ব্যক্তির ধর্মীয় কটূক্তি ছড়ানোকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে সেখানে প্রাণহানিসহ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়।

ঘটনা-৬

চলতি বছর ৭ জুলাই বাংলাদেশের অন্যতম ক্রিকেটার তামিম ইকবাল পরিবার নিয়ে ইংল্যান্ডের একটি ক্লাবের হয়ে খেলতে যান। সেখানকার ক্লাব এসেক্সের হয়ে ৮-৯টি ম্যাচ খেলার কথা থাকলেও একটি ম্যাচ খেলেই হঠাৎ দেশে ফিরে আসেন। অথচ এ বিষয় নিয়ে আমাদের মূলধারা সংবাদপত্রগুলো নানা রকম তথ্য ছাপিয়েছে। যেমন– দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, 'আতঙ্কে দেশে ফিরছেন তামিম'। ডেইলি স্টার শিরোনাম করেছে, 'হামলাচেষ্টা'র পর দেশে ফিরছেন তামিম। যুগান্তরের শিরোনাম, 'স্ত্রীর ওপর এসিড হামলার ভয়ে দেশে ফিরছেন তামিম'। মানবজমিনের শিরোনাম, 'এসিড হামলার পর দেশে ফিরছেন তামিম'। কিন্তু সংবাদের কোথাও তামিম ইকবালকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

যদিও তামিম ইকবাল তার ভেরিফাইড টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেছেন, কিছু প্রতিবেদনে তার পরিবারের বিরুদ্ধে 'হেইট ক্রাইম'-এর প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ এনেছে তা সত্যি নয়। ব্যক্তিগত কারণেই তিনি ইংল্যান্ড সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন। সঙ্গে হ্যাশট্যাগে বলেছেন, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ভালোবাসি। তামিম ইকবাল তার ভেরিফাইড ফেসবুক পাতায় এই একই কথা বলেছেন।

শুধু ভুয়া তথ্য বা গুজবের ওপর ভিত্তি করেই এসব কাজ করা হয়। ঘটনাটি সত্য না মিথ্যা, সেটা কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই না করেই এসব করা হচ্ছে।

ভুয়া খবরে সয়লাব বিশ্ব

বিশ্বে নানা ধরনের ভুয়া অসত্য তথ্যের বন্যা চলছে। প্রতিদিনই হাজার রকমের গুজব বা তথ্য কোনো না কোনো মাধ্যমে ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে অনলাইন মাধ্যমে এর প্রবণতা বেশি। সামাজিক মাধ্যম যেমন– ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউবসহ নানা মাধ্যমে এসব তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পারিবারিক ক্ষেত্রে নানান বিপত্তি ঘটছে।

সম্প্রতি ভারতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া খবর ছড়াছড়ির কারণে বেশ কয়েকটি গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছর এরকম ঘটনায় অন্তত ২৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। বিবিসির এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। এ বছর ভারত, কেনিয়া এবং নাইজেরিয়ায় ভুয়া খবরের ওপর বড়ো ধরনের এক গবেষণা করে বিবিসি। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বিকৃত তথ্য এবং ভুয়া খবর বিশ্বে মানুষের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটা অনুসন্ধান করে দেখা। এ গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছেন, তারা এক সপ্তাহ তাদের ফোন বিবিসিকে দেখতে দিয়েছেন। তারা কী ধরনের খবর শেয়ার করছেন, কাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন এবং কতবার শেয়ার করছেন, বিবিসির গবেষকরা সেসব পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এ তিনটি দেশেই দেখা গেছে, মূলধারার সংবাদমাধ্যমের ওপর জনগণের অনাস্থার কারণে তারা বিকল্প জায়গা থেকে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এসব তথ্য যাচাই-বাছাই করার কথা তারা ভেবেও দেখেনি। তার আগেই তারা এসব খবর শেয়ার করেছে। তারা মনে করেছে, এ খবরটি যত বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যাবে, ততই তার ভেতর থেকে হয়তো প্রকৃত খবরটি বেরিয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি এসব মানুষের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস খুব তীব্র– কোনটা আসল খবর আর কোনটা ভুয়া, সেটা তারা চিহ্নিত করতে পারে। ২০১৮ সালে যেভাবে ডিজিটাল তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে এ সমস্যার আরও অবনতি হয়েছে।

বিবিসির গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছেন, দেখা গেছে, কোনটা আসল খবর আর কোনটা ভুয়া, সেসব যাচাই করার ব্যাপারে তারা খুব কমই সচেষ্ট ছিলেন। এসব ভুয়া খবরের উৎস কী, সে বিষয়েও তাদের তেমন একটা মাথাব্যথা ছিল না। বরং খবরটি কতখানি সঠিক, সেটা যাচাই করতে গিয়ে তারা অন্য কিছু বিবেচনা করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে ফেসবুকের কোনো একটি পোস্টে কত মন্তব্য পড়েছে, কী ধরনের ছবি পোস্ট করা হয়েছে অথবা কে এই খবরটি দিয়েছে ইত্যাদি। তারা মনে করেন, নিজেদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হোয়াটসঅ্যাপে যেসব খবর শেয়ার করছেন, সেগুলো যাচাই না করেই সরাসরি বিশ্বাস করার মতো। হোয়াটসঅ্যাপে এরকম ভুয়া গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর ভারতে সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। ছেলেধরার ভুয়া ভিডিও তারা তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করেছে যাচাই না করেই। তারা মনে করেন, পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য এসব খবর শেয়ার করা তার দায়িত্ব ছিল।

মূলত চারটি উপায়ে এ ভুয়া খবরগুলো ছড়িয়ে থাকে।

১. ফেসবুক
২. ইউটিউব
৩. ভুয়া ওয়েবসাইট
৪. গণমাধ্যম

এসব মাধ্যমে প্রকাশিত ভুয়া খবরগুলো ইউজারদের লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের কারণে ভাইরাল হয়ে যায়। আবার অনেক গণমাধ্যম এসব সামাজিক মাধ্যমের তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই খবর প্রকাশ করে।

সম্প্রতি ভারতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া খবর ছড়াছড়ির কারণে বেশ কয়েকটি গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছর এরকম ঘটনায় অন্তত ২৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। বিবিসির এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে

ভুয়া খবর ছড়ানোর কারণ

ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ার পেছনে তিনটি কারণ তুলে ধরা হয়, যেমন–

১. বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কোণঠাসা করা
২. ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া
৩. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল

বিবিসি ভুয়া খবর শনাক্তের পাঁচটি উপায়ের কথা নির্দেশে করেছে আর সেগুলো হলো:

১. কমনসেন্স ব্যবহার করুন
২. খবরের কনটেন্ট বা তথ্য নিয়ে সন্দেহ হলে প্রতিটি যাচাই করুন
৩. অনলাইনে সার্চ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারেন
৪. খবরের তথ্যসূত্র বা ছবি/ভিডিওর উৎস বের করুন
৫. খবরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন

মিডিয়া লিটারেসির প্রয়োজনীয়তা

প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেটের বদৌলতে মানুষ এখন বেশি অনলাইননির্ভর। দিনের একটা বড়ো সময় কাটাচ্ছে অনলাইনে। সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এসব মাধ্যমে মানুষ খুব সহজেই যে কোনো কনটেন্ট বা আধেয় শেয়ার করতে পারে এবং সেটি নিমিষেই একটি বিরাট অংশের কাছে পৌঁছে যায়। এখানে কোনো ধরনের গেটকিপার বা সেন্সরশিপ না থাকায় যার যেটি ইচ্ছা সেটি শেয়ার করতে পারে। ফলে ভুয়া,

অসত্য, বানোয়াট গুজব তথ্য মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। অনেকেই মিডিয়া সাক্ষরতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় খুবই সরলভাবে সেটি বিশ্বাস করে এবং সেটি আরও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যার ফল দাঁড়ায় খুবই ভয়াবহ। অথচ মিডিয়া লিটারেসি সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা এ ধরনের অসত্য ও ভুয়া তথ্য থেকে নিজেকে এবং সমাজের বিশৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা করতে পারে।

গণমাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোনো বার্তা মাত্র পাঁচটি প্রশ্নের মাধ্যমে খুব সহজেই যাচাই করে দেখতে পারি–

১. কর্তৃপক্ষ (Author): কে বা কারা এই বার্তাটি তৈরি করেছে (Who made this message)
২. দর্শক-শ্রোতা বা পাঠক (Audience): এই বার্তা কোন ধরনের দর্শক শ্রোতা বা পাঠকের উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছে (Who is the target audience for this content)
৩. আধেয় বা বিষয়বস্তু (Content): কোন ধরনের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, কার প্রতিনিধি করছে অথবা এগুলো আসলে কি সত্য, না বানোয়াট? (What values or opinions are represented in this message, Is this message true)
৪. উদ্দেশ্য (Purpose): এই বার্তার উদ্দেশ্য কী (What is the purpose of this message)
৫. মাধ্যম বা ধরন (Format): কোন ধরনের মাধ্যমে এটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে এবং কেন (What has been done to get my attention)

মিডিয়া লিটারেসি শিক্ষা আজকের দিনে অত্যাবশ্যক। কারণ সীমাহীন উপায়ে আমরা তথ্য পেতে পারি। টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্কাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার অধ্যাপক ড. ল্যারি এটকিনসের মতে, 'সেলফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কেউ তথ্য প্রচার করতে পারে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা অগ্রিম বা ওয়েবসাইট ক্লিক থেকে অর্থ উপার্জন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে জাল খবরের গল্পের একটি বন্যা উৎপন্ন হয়। এমনকি উচ্চশিক্ষিত লোকরাও উন্নত ডিগ্রির সঙ্গে এই তৈরি কাহিনিগুলো পড়ে এবং তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হিসেবে মিডিয়া লিটারেসি

বর্তমান বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার্থীদের সংবাদ যাচাইবিষয়ক পড়ার জন্য প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সটি চালু করে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০০৬ সালে নিউজ লিটারেসি কেন্দ্র তৈরি করে, যা নিউইয়র্কের শিক্ষার্থীদের ভালো খবর বিশ্লেষক হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করে যাচ্ছে। আর এ প্রোগ্রাম সারা দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য বিদ্যালয়কে অনুপ্রাণিত করেছে।

বর্তমানে জোনাথন অ্যানজালোন স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর নিউজ লিটারেসির সহকারী পরিচালক এবং লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, 'দৈনন্দিন জীবনের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য অপরিহার্য। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে একজন নাগরিককেও অনেক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হয়।'

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া লিটারেসি এডুকেশন (ন্যামেল) যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে অবস্থিত একটি সাক্ষরতা শিক্ষা জার্নাল প্রকাশ করে এবং প্রতি নভেম্বরে মিডিয়া লিটারেসি সপ্তাহের স্পন্সর প্রকাশ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্টার ফর মিডিয়া লিটারেসি মাধ্যম সম্পর্কে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা উন্নত করার জন্য নির্দেশিকা, তথ্য এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সরবরাহ করে। মিডিয়া লিটারেসি বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলোয় চালু করার প্রয়াস চলছে।

ভুল তথ্য ও বক্তব্য দিয়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত বোকা বানাচ্ছেন সমাজের ক্ষমতাধর লোকেরা। আর আমরা বোকা হতে বাধ্য হচ্ছি কারণ প্রকৃত তথ্যটি আমাদের জানা নেই। তথ্যই শক্তি– এটি প্রমাণিত সত্য। যার কাছে সবচেয়ে বেশি, সঠিক এবং তাৎক্ষণিক তথ্য আছে, সে-ই বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতাবান-শক্তিশালী। আবার উল্টোটাও আছে। ভুল তথ্যকে সঠিকের মতো করে প্রচার করেও কেউ ক্ষমতাবান হয়ে উঠে। একই সঙ্গে তা কারো জন্য হয়ে উঠে ধ্বংসের কারণ। যার ভয়াবহতম উদাহরণ হচ্ছে ইরাক। প্রাত্যহিক জীবনে ভুল তথ্যের কারণে ছোটো-বড়ো ক্ষতির মধ্যে পড়ার শঙ্কা আছে। ভুল তথ্যের কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে কেউ ফতুর হয়ে যেতে পারেন। রাজনীতিবিদদের অনেকেই প্রতিদিন ভুল ও মিথ্যা বার্তা দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করে থাকেন। সংবাদমাধ্যম ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের বোকা বানায়। ভুল তথ্য দেওয়া বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে ঠকার কথা তো আমরা বুঝতেও পারি না। ধর্মীয় নেতার ভুল ব্যাখ্যায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে অমানুষ হয়ে উঠছে কিছু যুবক। লেখক-ইতিহাসবিদরা ভুল তথ্য, বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার ঘটনাও আমাদের কাছে খুবই পরিচিত।

এভাবে মিথ্যা, ভুল, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত আমাদের কেমন ক্ষতি করছে, তা আমরা একটু খেয়াল করলেই অনুমান করতে পারব। মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরশিপের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয় বিধায় তারা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে সঠিক তথ্যটি তুলে ধরতে পারে না। আবার হয়তোবা কেউ তার আদর্শিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে জেনে-বুঝেই এড়িয়ে যান সত্যকে। অন্যান্য সীমাবদ্ধতাও আছে সংবাদকর্মীদের। খুব সীমিত সময়ের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই একটি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সব পক্ষ ও সূত্র যাচাই করে সংবাদ তৈরি করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রকৃত সত্যটি মার খেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এজন্য প্রয়োজন এমন কিছু সংস্থা বা ব্যক্তির যারা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন নিরাসক্তভাবে। দেখার চেষ্টা করবেন ঘটনার সব দিক। ঘাঁটবেন একটি প্রচারিত তথ্যের বিপরীতে কী প্রামাণ্য তথ্য আছে। সময় তাদের অনুমতি নেওয়া এবং উৎসের নাম উল্লেখ করা, দেশের বিদ্যমান আইন সম্পর্কে জানা এবং আইন লঙ্ঘন না করা ইত্যাদি। এছাড়াও ডিজিটাল হয়রানি কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে এবং কোন সংস্থাগুলোর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, সেটাও শেখানো হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মুঠোফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে এখন নতুন শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি। যে কোনো আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ খবরের মাঝে দুই-একটা ভুয়া খবর ভাইরাল হওয়া এখন আর নতুন কিছু নয়। এ ভুয়া খবর ঠেকানো এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুজব ঠেকাতে সরকার এরই মধ্যে 'গুজব শনাক্তকরণ সেল' গঠন করলেও ভুয়া খবর ঠেকাতে শুধু আইনের কড়াকড়ি যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এ ফেক নিউজের কারণে কেউ রাজনৈতিকভাবে, কেউ সামাজিকভাবে আবার কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আগে ফেক নিউজ ছড়ানোটা অনেক জটিল ও ব্যয়বহুল ছিল। এখন ফ্রি সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এটা কোনো ব্যাপারই না। অনেকে এসব নিউজ ভাইরাল করে আয়ও করছে। তাই সচেতনতাটাই সবচেয়ে জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরিনের মতে, 'সাংবাদিকদের সচেতন ভূমিকার ওপর জোর দিতে হবে। ভুয়া খবর ছড়ানোর প্রবণতা এখন এতটাই বেড়ে গেছে যে, আমরা আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন সত্য বা বস্তুনিষ্ঠতার চেয়ে গুজব বা আবেগতাড়িত খবরগুলোর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। এখন মানুষের চেহারা-কণ্ঠ সবই বদলে দেওয়ার মতো প্রযুক্তি এসেছে। এতে মিথ্যা থেকে সত্যটা আলাদা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনেক বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।'

সুতরাং এখনই সময় মিডিয়া লিটারেসি সম্পর্কে জনগণের ভেতরে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সেটা অপরিহার্য। মানুষ যত সচেতন হবে, তত এসব অযাচিত খবর থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে এবং সমাজ ও দেশে স্থিতিশীলতার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. সানজানা চৌধুরী (২০১৮), বিবিসি বাংলার সেমিনার: কীভাবে চেনা যাবে 'ফেক নিউজ', ঠেকানোর উপায় কী, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১৮ (https://www.bbc.com/bengali/news-46224687)
২. সাব্বির খান (২০১৭), সমন্বয়হীনতায় 'ডিজিটাল লিটারেসি' ও 'মিডিয়া লিটারেসি', দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ জুন ২০১৭ (http://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2017/06/14/508615)
৩. https://malvorlagen-seite.de/bn/মিডিয়া-কর্মদক্ষতা
৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy
৫. https://www.youtube.com/watch?v=_uTaegsL8-k
৬. https://www.bbc.com/bengali/news-46176003

লেখক: *সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়*

গণমাধ্যম সাক্ষরতা
কী, কেন কার জন্য?

মিনহাজ উদ্দীন

'Media literacy is the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety contexts'—Sonia Livingstone.

(গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকার, আধেয় বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং বার্তা তৈরির সামর্থ্য – সোনিয়া লিভিংস্টোন)

বিশ্ববরেণ্য গণমাধ্যম তাত্ত্বিক হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহানের (Herbert Marshall McLuhan) মতে বিশ্বগ্রাম (Global Village) এখন আরও ছোটো, সংকুচিত। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের এই যুগে মানুষের বিচরণ এখন বিশ্বগ্রামের প্রতিটি ঘরে। কোথায় কী ঘটছে, ঘরে বা বাইরে, সমুদ্রতলে, মহাশূন্যে– সবকিছুই এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। আক্ষরিক অর্থেই ইন্টারনেটযুক্ত একটি স্মার্টফোনের মাধ্যমে বিশ্ব চলে এসেছে মানুষের মুঠোয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (বিশেষ করে, টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য) মানুষের জীবনে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। চলতি বিশ্বে বহুল প্রচলিত এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছে, ঠিক তেমনি অপপ্রচার, ভুল তথ্য, ইচ্ছাকৃত বিকৃত তথ্য, আধা সত্য তথ্য প্রচার বা প্রকাশের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের বিভ্রান্তি। যাতে অনেকেই বিপথে পরিচালিত হচ্ছেন। বাড়ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঝুঁকি। সংঘাত, সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ভুল সংবাদ প্রচার-প্রকাশ এবং তা থেকে সংঘাতের বেশকিছু ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে, যা পরের কয়েক বছর অব্যাহত ছিল। যার ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। সে সময় ভুয়া সংবাদ প্রচার-প্রকাশ বা শেয়ারের মাধ্যমে একটি

পক্ষকে উত্তেজিত করা হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে একটি গোষ্ঠী মুক্তমনা লেখক, প্রকাশক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ভিন্ন মতাবলম্বী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এমন বাস্তবতায় প্রথমবার বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি (Media Literacy) প্রবলভাবে আলোচনায় আসে।

বস্তুতপক্ষে সার্বিক ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৫৯ লাখ। যাদের মধ্যে ৮ কোটি ১ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন মোবাইল ফোনে (ইত্তেফাক, ২৮ মে)। বিটিআরসি'র এ তথ্য থেকেই অনুধাবন করা যায়, বাংলাদেশে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বাড়বে। সামনে হয়তো এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সংবাদ প্রাপ্তি, সংবাদ ব্যাখ্যা, সংবাদ তৈরিতে (Production) পুরোপুরিভাবে মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষাপটেই মূলত বাংলাদেশ তথা বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতার (Media Literacy) বিষয়টি অতি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। আর বাংলাদেশে যেহেতু এই বিপুল সংখ্যক মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে সিংহভাগই তরুণ, তাই তাদের এ বিষয়ে সাক্ষর ও শিক্ষিত করা খুবই জরুরি।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও ইউনেস্কো

গণমাধ্যম সাক্ষরতার আলোচনা খুব বেশি পুরোনো নয়। মাত্র দুই দশকে এ বিষয়টি বড়ো পরিসরে আলোচিত হচ্ছে। বিশ্ব পরিসরে এ আলোচনা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে বিস্তারে বড়ো ভূমিকা রাখে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো। ২০১৩ সালে সংস্থাটি গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিয়ে তাদের ধারণাপত্র 'Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies' প্রকাশ করে। যাতে বলা হয়, 'There is no single notion of literacy which people possess or not, but multiple literacies. Thus literacy becomes situational, pluralistic and dynamic.'

অর্থাৎ, পৃথিবীতে সাক্ষরতার একক কোনো ধারণা বা মত নেই, যা মানুষ গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে। ফলে সাক্ষরতা হয়ে ওঠে বহুত্ববাদী, প্রগতিশীল, পরিস্থিতিগত।

এমন প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিয়ে ইউনেস্কোর সংজ্ঞায় বলা হয়, 'A set of competencies that empowers citizens to access, retrieve, understand, evaluate and use to create as well as share information and media content in all formats, using various tools, in critical, ethical and effective way, in order to participate and engage in personal, professional and social activities.'

অর্থাৎ, গণমাধ্যম সাক্ষরতা এমন একধরনের সম্মিলিত সামর্থ্য, যার মাধ্যমে একজন নাগরিক গণমাধ্যমে প্রবেশ, আধেয়র অর্থ উদ্ধার, বুঝতে পারা, মূল্যায়ন করা এবং সঙ্গে গণমাধ্যমের জন্য আধেয় তৈরির যোগ্যতা অর্জন করে। একই সঙ্গে তথ্য বিনিময় করা এবং বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করে নানা বিন্যাসের সংবাদ তৈরির সামর্থ্য অর্জন করা। ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্টতা তৈরিতে গণমাধ্যম সাক্ষরতার অন্যতম লক্ষ্য থাকে আধেয়গুলোর সমালোচনামূলক, নৈতিক এবং যথাযথ উপায়ে বিশ্লেষণ দাঁড় করানো।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও সোনিয়া লিভিংস্টোন

গণমাধ্যম তাত্ত্বিক অধ্যাপক সোনিয়া লিভিংস্টোন (Sonia Livingstone) লন্ডনের স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান ছিলেন। পেশাগত জীবনে তার মূল বিশেষত্ব ছিল সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)। তিনি তার একাডেমিক জীবনে শিশু, গণমাধ্যম এবং ইন্টারনেট নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করেছেন। বই লিখেছেন ১৮টি। আর তার গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের প্রভাবশীল সব জার্নালে। তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন বার্জেন, কোপেনহেগেন, হার্ভার্ড, ইলিনোস, মিলান, প্যারিস, স্টকহোমসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। লন্ডনের 'The London School of Economics and Political Science'-এর জার্নালে 'What is Media Literacy' (2004) শিরোনামে তার একটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয়। যাতে তিনি Media Literacy-এর সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি গণমাধ্যম সাক্ষরতার (Media Literacy) একটি সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তার মতে, 'Media literacy is the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety contexts.' (Sonia Livingstone: 2004)

অর্থাৎ, গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকার, আধেয় বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং বার্তা তৈরির সামর্থ্য। (সোনিয়া লিভিংস্টোন: ২০০৪)।

সোনিয়া লিভিংস্টোন (Sonia Livingstone) বড়ো পরিসরে গণমাধ্যম সাক্ষরতার সংজ্ঞা নিয়ে বড়ো পরিসরে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন চারটি সামর্থ্যের মাধ্যমে একজন নাগরিক গণমাধ্যম সাক্ষর হতে পারে। সেগুলো হলো:

কয়েক বছর ধরে গণমাধ্যম সাক্ষরতা একধরনের বৈশ্বিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ, দেশ এমনকি পুরো বিশ্বের জন্যই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ দেশে গণমাধ্যম ব্যবহারকারী বা গণমাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে

ক. গণমাধ্যমে প্রবেশের সামর্থ্য (Ability to access)
খ. বিশ্লেষণের সামর্থ্য (Analyze)
গ. মূল্যায়নের সামর্থ্য (Evaluate)
ঘ. আধেয় তৈরির সামর্থ্য (Content Creation)

গণমাধ্যম সাক্ষরতা কেন প্রয়োজন

কয়েক বছর ধরে গণমাধ্যম সাক্ষরতা একধরনের বৈশ্বিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ, দেশ এমনকি পুরো বিশ্বের জন্যই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ দেশে গণমাধ্যম ব্যবহারকারী বা গণমাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১৬ সালের ৪ এপ্রিল জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সংসদকে জানান, দেশে দৈনিক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৪৩০টি। সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে ৯৩টি, পাক্ষিক ২০টি, মাসিক ২৩টি। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০১৬)। আর টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৩৩টি। এফএম রেডিওর সংখ্যা ২৮টি আর কমিউনিটি রেডিও চালু আছে ১৭টি। সম্প্রতি রেডিও বড়াল নামে নতুন একটি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারে আসার অপেক্ষায় আছে। এত বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যমের ভাষা যেমন বুঝতে পারা জরুরি আবার এগুলোর জন্য আধেয় তৈরিতেও নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন জরুরি। যাতে প্রয়োজন গণমাধ্যম সাক্ষরতা (media literacy).

রেনে হবস (Renee Hobbs) আমেরিকার তাত্ত্বিক। তিনিও গণমাধ্যম সাক্ষরতা নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন। কমিউনিকেশন স্টাডিজ নিয়ে অধ্যাপনা করেছেন হ্যারিংটন স্কুল অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া'তে। এছাড়া তিনি ইউনিভার্সিটি অক রোডে আইল্যান্ডের মিডিয়া এডুকেশন ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিশ্বে গণমাধ্যম সাক্ষরতা (media literacy) সংক্রান্ত শিক্ষা কেন প্রয়োজন, তা তিনি তুলে ধরেছেন তার Digital and Media Literacy: A Plan of Action (2010) বইয়ে। তাতে রেনে হবস গণমাধ্যম সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন–

'When people have digital and media literacy competencies, they recognize personal, corporate and political agendas and are empowered to speak out on behalf of missing voices and omitted perspectives in our communities. By identifying and attempting to solve problems, people use their powerful voices and their rights under law to improve the world around them.' (Hobbs, 2010).

অর্থাৎ, যখন মানুষের গণমাধ্যম ও ডিজিটাল সাক্ষরতা থাকে, তখন তিনি ব্যক্তিগত, করপোরেট/বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক এজেন্ডার বিষয়গুলো বুঝতে পারেন। একই সঙ্গে যে কথা বলা হয়নি, সেই অনুচ্চারিত শব্দগুলোও শব্দ করে বলার সামর্থ্য রাখেন। অন্যদিকে আড়ালে চলে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলতে পারেন। গণমাধ্যম সাক্ষরতার মাধ্যমে একজন নাগরিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। একই সঙ্গে তাদের আইনগত অধিকার অর্জন করে চারপাশে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে পারেন।

মিডিয়া কোষে গণমাধ্যম সাক্ষরতার সংজ্ঞা

গণমাধ্যমে প্রবেশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়া সম্পর্কিত পূর্বধারণাগুলোকে নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে গণমাধ্যমের বার্তার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং অনুধাবনই হলো মাধ্যম সাক্ষরতা। মাধ্যম সাক্ষরতা বলতে প্রধানত বোঝায়, গণমাধ্যমের সুবিধাবঞ্চিত কিংবা বলা চলে গণমাধ্যমের বার্তা এবং এর প্রভাব ক্ষমতাকে যথাযথভাবে অনুধাবনে অক্ষম জনগোষ্ঠীর কাছে গণমাধ্যমকে বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করতে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা সরবরাহকরণ। (মিডিয়া কোষ: ২০১৩)

গণমাধ্যম সাক্ষরতা কার জন্য

একটি কথা এখানে বলা অতি প্রয়োজন যে, গণমাধ্যম সাক্ষরতা বলতে শুধুই সংবাদ বা সংবাদের উপাদান সম্পর্কিত সাক্ষরতাকে বোঝায় না। এখানে সাক্ষরতা বোঝানো হয় সার্বিক অর্থে। সব মাধ্যমের আধেয়কে। যেসব বিষয়ে মানুষের সাক্ষরতা অর্জন খুবই জরুরি। সাধারণত গণমাধ্যমের আধেয়তে দুইটি পক্ষ থাকে– ক. আধেয় উৎপাদনকারী (Producer/Creator), খ. আধেয় গ্রহণকারী (Consumers/ Listener/ Viewer/ Reader)। গণমাধ্যম সাক্ষরতা মূলত এ দুই পক্ষেরই বেশি প্রয়োজন। রাষ্ট্র কাঠামোয় আরও কয়েকটি অঙ্গের গণমাধ্যম সাক্ষরতা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি।

মনে রাখতে হবে, সাক্ষরতা শুধুই দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের জন্য নয়। যারা বার্তা তৈরি করেন, তাদেরও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ সাক্ষরতা প্রয়োজন। কোন বার্তা কীভাবে কোন মাধ্যমে দিতে হবে, সে বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষণ অতি জরুরি। তা না হলে কোনো বার্তা প্রকৃত অর্থ নিয়ে গ্রহীতার কাছে পৌঁছবে না। যেমন, গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প চালু করেছিল। যার মূল স্লোগান ছিল– 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'। মূলত সন্তান দুটির বেশি না নিতেই এ স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এর একটি একেবারেই নেতিবাচক এবং এতে উল্টো প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল দেশের একটি জেলায়। যেখানে হঠাৎ করেই বাল্য বিবাহের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, এতে সরকারের 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' প্রকল্পের এক প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল। কারণ ওই এলাকার মানুষ মনে করত, ছোট পরিবার মানে কম বয়সি স্ত্রী, আর সুখী হতে হলে কম বয়সি স্ত্রি ঘরে থাকা অপরিহার্য! এখানে বার্তা তৈরিতে সতর্ক না থাকায় একধরনের বিপর্যয় তৈরি হয়েছিল। যাই হোক, এই উদাহরণ থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, গণমাধ্যম সাক্ষরতা তাদের জন্য খুবই জরুরি ছিল।

অন্যদিকে গণমাধ্যমের আধেয় প্রেক্ষাপটে অবশ্যই সাক্ষরতা বেশি প্রয়োজন আধেয় গ্রহণকারীর (Consumers/ Listener/ Viewer/ Reader) জন্য। কারণ প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যম বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাদের আধেয় তৈরি করে। তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, প্রভাবিত করতে চায়। যার মাধ্যমে তারা অর্জন করতে চায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বার্তার সূত্র, বার্তার ধরনসহ নানা বিষয়ে একজন নাগরিককে সচেতন থাকতে হয়। আবার অনেক আধেয়ের লক্ষ্য থাকে কাউকে উত্তেজিত করে কোনো স্বার্থ সিদ্ধি করা, যা আমরা বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেই প্রত্যক্ষ করেছি।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা দরকার রাষ্ট্রের সেই অঙ্গগুলোর, যারা গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমের আধেয়, এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে কাজ করে, যা নিয়ন্ত্রক অথবা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা রাখে। কারণ তারা যদি বিষয়টি সম্পর্কে ভালো না জানে, তাহলে একধরনের দূরত্ব তৈরি হতে পারে। যার ফল ভালো না-ও হতে পারে।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গণমাধ্যম সাক্ষরতা অতি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়:

ক. আধেয় উৎপাদনকারী (Producer/Creator)
খ. আধেয় গ্রহণকারী (Consumers/Listener/ Viewer/ Reader)।
গ. গণমাধ্যম পর্যবেক্ষক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (Mass media observatory Government and Non Governmental organizations.)
ঘ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (Law enforcing agencies)

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও **SACMID-***এর উদ্যোগ*

মার্ক প্রেন্সকি (Marc Prensky) একজন বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি বর্তমান প্রজন্মকে 'Digital Natives' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে আরেক স্বনামধন্য তাত্ত্বিক লুইস লিয়াং (Louis Leung) বর্তমান প্রজন্মকে আখ্যায়িত করেছেন 'Net Generation' নামে। বাংলাদেশে এই তরুণ প্রজন্ম বা Digital Natives, Net Generation-কে মূল উপজীব্য করে 'Promoting Media Literacy in Bangladesh: A baseline survey on media literacy among secondary students in Dhaka city' শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে South Asia Center For Media in Development (SACMID).'

সরকার বারবাক কারমাল (পিএইচডি), সৈয়দ কামরুল হাসান ও আফিয়া সুলতানা ২০১৮ সালের জুনে যৌথভাবে গবেষণাটি পরিচালনা ও গবেষণাপত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। ঢাকার ১৬টি স্কুলের মাধ্যমিক স্তরের ৫০০ শিক্ষার্থীর ওপর এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। যার ফলাফলে দেখা যায়, ৭২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ইন্টারনেটযুক্ত মোবাইল (স্মার্টফোন) ব্যবহার করে। যাদের মধ্যে শতকরা ৩২.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেসবুক থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ জানে। South Asia Center For Media in Development (SACMID)-এর এই গবেষণা ও নানা বিষয় নিয়ে কথা হয় সংস্থাটির উপপরিচালক ও গণমাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রধান সৈয়দ কামরুল হাসানের সঙ্গে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা কেন প্রয়োজন?

সৈয়দ কামরুল হাসান: যুগ যুগ ধরে সাক্ষরতা বলতে আমরা বুঝেছি পড়া ও লেখার সক্ষমতা। কিন্তু আজকের ক্রমপ্রসারমাণ ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে এসে বেশির ভাগ তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছায় নানাবিধ গণমাধ্যমের সাহায্যে। ফলে সাক্ষরতার একটি নতুন চাহিদা তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অভাবনীয় দ্রুতগতিতে ইন্টারনেটের বিকাশ ঘটেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং রেডিও, টেলিভিশন ও ফেসবুকসহ সব ধরনের গণমাধ্যমে প্রবেশের অবারিত সুযোগ একদিকে ভোক্তা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের সামনে যেমন খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত, তেমনি আবার এর অপব্যবহারের সুবাদে সৃষ্টি হয়েছে বিপথে যাওয়ার আশঙ্কাও। দেখা যাচ্ছে যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ এখনো তাদের অনেক কম, বিনোদনসহ অন্যান্য তথ্য ও উপকরণ তারা বাছবিচারের তোয়াক্কা না করে গলধঃকরণ করছে। ফলে তাদের অজান্তেই তারা নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। ইন্টারনেটে হয়রানি, হুমকি, গুজব, অপপ্রচার ইত্যাদির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় হত্যা, আত্মহত্যা, গুম হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এ

পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা এবং গণমাধ্যম সংক্রান্ত সাক্ষরতা। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে যে কোনো উদ্যোগের প্রাথমিক ধাপ হতে পারে আমাদের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা, যারা গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির প্রাথমিক ব্যবহারকরী।

এ উপলব্ধি থেকেই চলতি বছর সাকমিড 'প্রমোটিং মিডিয়া লিটারেসি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ওই কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি সাকমিড পরিচালিত এক গবেষণায় লক্ষ করা গেছে, ঢাকা শহরভিত্তিক শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী কোনো না কোনোভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অথচ যে সংবাদ বা তথ্য তারা পায়, তা আদৌ নির্ভরযোগ্য কি না বা সাইবার জগতে নিরাপত্তা বিষয়ে কী কী পূর্বপ্রস্তুতি তাদের থাকা দরকার, সে সম্পর্কে সিংহভাগ শিক্ষার্থীর কোনো ধারণা নেই।

প্রশ্ন: দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এই সাক্ষরতার প্রসার কেন জরুরি?

সৈয়দ কামরুল হাসান: বিশ্বের নানা প্রান্তের গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মতে এবং নানাবিধ সূচকের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার হার, প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বড়ো শক্তি প্রযুক্তির প্রধান ব্যবহারকারী আমাদের যুবসমাজ (নারী ও পুরুষ), যারা বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ। তাদের রয়েছে কর্মস্পৃহা, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন। তরুণ এ প্রাণশক্তিকে কাজে লাগানো এই সময়ের সুযোগও বটে। বাংলাদেশে ক্রমবিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যম এবং দেশের জনগোষ্ঠীর মূল অংশ তরুণদের দ্বারা এর ব্যাপক ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে এ সংক্রান্ত সাক্ষরতা জ্ঞানের প্রসার তাই অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন: যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতা অর্জন না করা যায়, তাহলে কী ধরনের বিপদ সামনে অপেক্ষা করছে?

সৈয়দ কামরুল হাসান: সন্দেহ নেই, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা পিছিয়ে পড়ব।

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট করে জঙ্গিবাদ, অপপ্রচার বা মৌলবাদী মতাদর্শ প্রচার বা বিনিময় বন্ধে গণমাধ্যম সাক্ষরতার ভূমিকা কী হতে পারে?

সৈয়দ কামরুল হাসান: গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদ ও ছবির অপপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া আমরা রামুর ঘটনা, এমনকি অতি সাম্প্রতিক নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে গণমাধ্যম সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু করা জরুরি। গণমাধ্যমে সাক্ষর একজন ব্যক্তি প্রাত্যহিক জীবনে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক, বিলবোর্ড, ভিডিও গেমস, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। গণমাধ্যম সংক্রান্ত শিক্ষা ও সাক্ষরতার যে কোনো উদ্যোগ কেবল গণমাধ্যম ভোক্তার সংখ্যাই বৃদ্ধি করবে না, বরং গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে। জনসাধারণ প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার, তথ্যসূত্রের যথাযথ অনুসন্ধান, তথ্যের সঠিকতা যাচাই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন প্লাটফর্মে ইস্যুভিত্তিক জনমত গঠনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে। আজকের দুনিয়ায় প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার নেটওয়ার্কের সুবাদে বা মাধ্যমে এককভাবে গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করতে পারে (ব্লগ, টুইটার)। এভাবে একক ব্যক্তি বৃহত্তর জনপরিসরে ভূমিকা রাখতে পারে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে পারে, মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে পারে এবং সমাজে বিদ্যমান নানা গোষ্ঠী ও মতাবলম্বীর মধ্যে কার্যকর সংলাপ ও মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। আর এভাবেই জঙ্গিবাদ, অপপ্রচার বা মৌলবাদী মতাদর্শ প্রচার বা বিনিময় বন্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিস্তারে অবিলম্বে কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া অতীব জরুরি?

সৈয়দ কামরুল হাসান: সাক্ষরতাবিষয়ক বহু গবেষক ও তাত্ত্বিক এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, গণমাধ্যমে সাক্ষরতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য গণমাধ্যম সাক্ষরতাকে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে একুশ শতকের একটি নতুন ও অভিনব উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গণমাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনের জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ। প্রয়োজন শিক্ষা কারিকুলামে এর যথাযথ সন্নিবেশ ঘটানো। স্থানীয় শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করা দরকার। প্রশিক্ষণ সহযোগিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ই-বুক, ডিজিটাল কনটেন্ট, মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন এবং কিশোর বাতায়নসহ নানা ধরনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি অনুমোদিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আরও একটি মাইলফলক। সরকার গৃহীত এসব পদক্ষেপকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সাকমিড শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সম্পৃক্তকরণ ও চলমান পাঠক্রমের পাশাপাশি ঢাকার কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে কো-কারিকুলাম বা সহায়ক মিডিয়া কনটেন্ট ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে সাকমিড এটুআই-এর সঙ্গে যৌথভাবে ঢাকার ১০টি স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন-কর্মশালার আয়োজন করেছে এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে মিডিয়া লিটারেসি গ্রুপ গঠন করেছে। ব্যাপক ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাকমিড অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি কৌশলপত্র প্রণয়নে হাত দিয়েছে।

২০০৩ সালে যুক্তরাজ্য তাদের কমিউনিকেশন আইনে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশও বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। একই সঙ্গে ইউনেস্কো এবং অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংস্থা এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। যাদের লক্ষ্য একটাই, তা হলো– ঝুঁকিমুক্ত সামাজিক যোগাযোগ ও মূলধারার গণমাধ্যম নিশ্চিত করা। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ। যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কার্যকর পদক্ষেপ দরকার এখনই।

তথ্যসূত্র

১. Livingstone, S. (2004) 'What is Media Literacy' UK: Mdia@LSE.

২. Hobbs, R. (2010), Digital Media Literacy: A plan of action, Aspen Institute. https://mediaeducationlab.com/sites/default/files/Hobbs%2520Digital%2520and%2520Media%2520Literacy%2520Plan%2520of%2520Action_0_0.pdf

৩. আহমেদ, মুসতাক. ইসলাম, আমিনুল। মিডিয়া কোষ (২০১৩)। ঢাকা: এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক। ২৮ মে, ২০১৮। http://www.ittefaq.com.bd/science-and-tech/2018/05/28/158554.html

৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ জুলাই ২০১৬।

৬. 'Promoting Media Literacy in Bangladesh: A baseline survey on media literacy among secondary students in Dhaka City' June 2018. South Asia center for media in development (SACMID)

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা

শুভ কর্মকার

পশ্চিমা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ডিজিটাল এবং মাধ্যমবাহিত হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথাগত মাধ্যম ও ডিজিটাল মাধ্যমের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিনিয়ত অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। শিল্পসমাজের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে তথ্যসমাজে রূপান্তরিত করে চলেছে ডিজিটাল মিডিয়া। পূর্বের সম্পর্ক বিধানের পরিবর্তে ডিজিটাল সংস্কৃতি ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইন্টারনেটের বদৌলতে আমরা অনেক বেশি জনগণের কাছাকাছি যেতে পারছি। মিডিয়া এবং মিডিয়ার বিষয়বস্তু শৈশব, যৌবন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যকার সীমানা তুলে দিয়েছে। বয়সের ভেদাভেদ ভুলে সব ধরনের তথ্যে সবার প্রবেশযোগ্যতার অনুমতি মিলেছে। ফলে এই ধরনের পরিবেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানবাধিকারের প্রশ্নে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রশ্ন তো আছেই, বিশেষ করে শিশুদের নিরাপদ গণমাধ্যম ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মানবাধিকারের বিষয়টি সামনে আসে। আরেকটি বিষয় হলো– তথ্যপ্রযুক্তি মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। গণমাধ্যমের অফুরান তথ্যের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন কোনো কাজ না। তবে 'সঠিক' আর 'ভুল' তথ্য খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। এছাড়া গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত 'ফেকনিউজ', 'গুজব', 'মিথ্যা তথ্য', 'ভুল তথ্য' গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়গুলোয় এখনও গণমাধ্যম শিক্ষা এবং গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা শক্ত কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে গণমাধ্যম সাক্ষরতা, গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার উপকারিতা, গণমাধ্যম সাক্ষরতার মৌলিক নীতি, গণমাধ্যম শিক্ষার পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা

গণমাধ্যম প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যম শিক্ষা বিকশিত হয়েছে। গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগের যুগে গণমাধ্যমের বার্তা গ্রহণে অবধারণগত এবং সমালোচনামূলক সক্ষমতা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা এই প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করবে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা গণমাধ্যমের বার্তায় প্রবেশযোগ্যতার পাশাপাশি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার সক্ষমতা তৈরি করে। গণমাধ্যম প্রদত্ত বার্তাকে ব্যবহার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সমালোচনা করার জ্ঞান, দক্ষতা এবং সক্ষমতা তৈরি করার প্রক্রিয়াই গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার উপকারিতা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর মিডিয়া লিটারেসি গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার ১০টি উপকারের বিষয় উল্লেখ করে।

ক. গণমাধ্যমের বুদ্ধিমান ভোক্তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবে গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা।

খ. গণমাধ্যম বিশ্বের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের সংযুক্ত হওয়ার ফলে 'বাস্তব জীবন' শিক্ষায় ব্যস্ত থাকবে শিক্ষার্থীরা।

গ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমালোচনামূলক চিন্তা করার সক্ষমতা তৈরি হবে।

ঘ. সব বিষয় একীভূত করার সম্ভাবনার ক্ষেত্র এবং সব ডিসিপ্লিনে প্রয়োগ করা যায় এমন সাধারণ শব্দভান্ডার তৈরি করবে গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা।

ঙ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় সমকালীন গণমাধ্যম উৎপাদনের মান বুঝতে সাহায্য করে।

চ. মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের চিন্তা ও ধারণার যোগাযোগ (প্রচার/প্রকাশ) এবং বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ছ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা হলো 'অনুসন্ধান প্রক্রিয়া'। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে (প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য প্রদান করেন) থেকে শিক্ষা প্রদান করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে শিক্ষা প্রদান করবেন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।

জ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পরিবর্তে প্রক্রিয়াগত দক্ষতার (যেমন– গণমাধ্যমের ব্যবহারিক দিক ভিডিওচিত্র ধারণ করা, সম্পাদনা করা, স্থিরচিত্র তোলা ইত্যাদি) ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।

ঝ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কিত রেপ্লিকেবল মডেল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

ঞ. এ শিক্ষা ব্যক্তিগতভাবে শুধু শিক্ষার্থীদেরই উপকার করে না বরং সমাজও উপকৃত হয়।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার মৌলিক নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার জাতীয় সংস্থা (NAMLE) গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার মৌলিক নীতিমালা তুলে ধরে। মৌলিক নীতিগুলো হলো:

ক. আমরা গণমাধ্যম থেকে যেসব বার্তা গ্রহণ এবং তৈরি করি, সেসব বার্তার জন্য গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষায় প্রয়োজন সক্রিয় অনুসন্ধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তা। গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বার্তাকে সমালোচনা ও সক্রিয় অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখতে হলে শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই বেশকিছু বিষয়ের সমন্বয় থাকতে হবে। বিষয়গুলো হতে পারে:

- গণমাধ্যমের সব বার্তাই 'নির্মিত'।
- প্রত্যেকটি মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য, শক্তি আলাদা এবং নির্মাণের ভাষাও অনন্য।
- বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য গণমাধ্যমের বার্তা উৎপন্ন হয়।
- সব গণমাধ্যমের বার্তাই দৃষ্টিকোণ এবং অনুবিদ্ধ মূল্য ধারণ করে।
- গণমাধ্যমের বার্তা থেকে সাধারণ জনগণ তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজস্ব অর্থ উৎপন্ন করে।
- গণমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের বার্তা বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্য, আচরণ, এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শক্ত সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার অর্থ শুধু গণমাধ্যম বার্তা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করা নয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যমের সমালোচনা করতে সহায়তা করে।

খ. গণমাধ্যমের সব ধারা নিয়েই গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার ধারণা (যেমন– লেখা, পড়া) বিস্তৃত হয়েছে। মুদ্রণ সাক্ষরতার বিষয়ে পড়া এবং লেখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে যেমন– প্রথাগত মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, গ্রাহক-সৃষ্ট এবং তারবিহীন মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। গণমাধ্যমের গঠন, সমাজের পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম 'টেক্সট' সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

গ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা সব বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য দক্ষতা তৈরি ও শক্তিশালী করে। প্রথাগত বিদ্যায়তনিক সাক্ষরতার মতো গণমাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো সমন্বিত, মিথস্ক্রিয় এবং পুনঃপুনঃ অনুশীলনের প্রয়োজন। গণমাধ্যম সাক্ষরতার দক্ষতা 'আছে অথবা নেই' এভাবে বলা যাবে না। গণমাধ্যম সাক্ষরতা হলো দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিকতা। প্রথাগত শিক্ষার মতো দিনে একটি বা সপ্তাহে দুটি ক্লাসের মতো গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা প্রদান করা যাবে না। বরং শিক্ষার্থীদের ব্যাপক এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ ও প্রকাশের দক্ষতার উন্নয়ন ও চর্চা করাতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা প্রদান করতে হবে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা তখনই কার্যকর হবে, যখন সহশিক্ষা জ্ঞানকাণ্ড ব্যবহার করা হবে। এই সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষক শিখবে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ও ক্লাসমেট উভয়ের কাছ থেকেই শিখবে। গণমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে এবং গণমাধ্যমের বার্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখবে। গণমাধ্যমে কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি ঘটনা 'সংবাদ' হয়ে ওঠে, সেটি জানলে শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যমের বার্তা সম্পর্কে সুষ্ঠু বিচার করতে সক্ষম হবে।

গণমাধ্যমের সব ধারা নিয়েই গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার ধারণা (যেমন– লেখা, পড়া) বিস্তৃত হয়েছে। মুদ্রণ সাক্ষরতার বিষয়ে পড়া এবং লেখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে যেমন– প্রথাগত মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, গ্রাহক-সৃষ্ট এবং তারবিহীন মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে

ঘ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম বার্তা সম্পর্কে অবগত করে এবং বার্তায় অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করে, যা গণতান্ত্রিক সমাজ তৈরির জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজ দেশের গণমাধ্যম বার্তা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা শেখাবে, ফলে শিক্ষার্থীরা সংবাদ এবং চলমান ঘটনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের

অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা আরও বেশি বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে। গণমাধ্যমের বার্তার 'রিপ্রেজেন্টেশন', 'ভুল রিপ্রেজেন্টেশন' এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে দেশীয় সংস্কৃতির রিপ্রেজেন্টেশনের অভাব ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করতে শিখবে। গণমাধ্যম বার্তার অর্থ তৈরির ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কাঠামো (যেমন– মালিকানা, বিতরণ ইত্যাদি) কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থী পূর্ণজ্ঞান অর্জন করবে।

ঙ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা গণমাধ্যমকে সামাজিকীকরণের এজেন্ট হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা সংস্কৃতি এবং কার্যক্রমের অংশ। গণমাধ্যমের বার্তা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরের উপস্থাপন করে থাকে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকল্প মাধ্যম পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই সহিংসতা, লিঙ্গবৈষম্য, যৌনতা, বর্ণবাদ, এবং রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে– এমন অন্যান্য ইস্যু নিয়ে আলোচনা থাকবে।

চ. গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা নিশ্চিত করে যে, মানুষ তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা গণমাধ্যম বার্তা থেকে নিজস্ব অর্থ তৈরি করে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা এটা শেখাবে না যে, শিক্ষার্থীরা কী চিন্তা করবে। শিক্ষার্থী তাদের নিজস্ব মূল্য দিয়ে কীভাবে বার্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে সে বিষয়টি গণমাধ্যম সাক্ষরতায় শেখানো হবে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মূল্যবোধের সঙ্গে গণমাধ্যম বার্তাকে মিলিয়ে অর্থ তৈরির বিষয়ে সচেতন থাকবে। গণমাধ্যমের বার্তার 'সত্য', 'সঠিক', অথবা 'অন্তর্নিহিত' অর্থ উন্মোচন করা বা চিহ্নিত করার বিষয়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষা সহায়তা প্রদান করবে। গণমাধ্যম বার্তার 'ভালো' এবং 'খারাপ' অর্থ উন্মোচন করার বিশ্লেষণাত্মক বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হবে। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণমাধ্যম বার্তার ব্যাখ্যার ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। এটিকে ভুল বলা যাবে না। বয়স এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের বার্তার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। দলীয় আলোচনা এবং গণমাধ্যম বার্তার বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বার্তা বুঝতে সাহায্য করবে। নিজস্ব পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে বার্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্তও আলাদা আলাদা হতে পারে।

গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার পাঠক্রম (সম্ভাব্য)

বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভাব্য গণমাধ্যম সাক্ষরতা শিক্ষার পাঠক্রম তুলে ধরা হলো:

ক. প্রাথমিক জ্ঞান: গণমাধ্যমের সংজ্ঞা, গণমাধ্যম অধ্যয়ন, গণমাধ্যম সাক্ষরতা
খ. গণমাধ্যম বার্তার অর্থ উৎপন্ন: ভাষা, রিপ্রেজেন্টেশন এবং ভাষার উদ্দেশ্য, গণমাধ্যম বার্তা কারা উৎপন্ন করে
গ. গণমাধ্যম ব্যবস্থাপকরা বার্তা বিশ্বাসযোগ্য করতে কী কী উপাদানের সমন্বয় ঘটায়, প্রভাবনের যন্ত্র
ঙ. 'পক্ষপাত', 'অর্থ উল্টানো', 'ভুল তথ্য', 'মিথ্যা', 'ফেক নিউজ', 'গুজব' সম্পর্কে পরিচিতকরণ
চ. গণমাধ্যম বার্তার না-বলা বিষয়গুলো উন্মোচন করা (শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা)
ছ. শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের বার্তাকে মূল্যায়ন করা (ব্যবহারিক ক্লাস)
জ. গণমাধ্যম বার্তা নির্মিত চিত্র বা ভিডিওচিত্রের রং, আঙ্গিক, গভীরতা, চিত্র ও ভিডিওচিত্র বিশ্লেষণ (ব্যবহারিক ক্লাসের অংশ হিসেবে চিত্র ও ভিডিওচিত্র নির্মাণের প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করতে হবে। এছাড়া তাত্ত্বিক বিষয়ের উপস্থিত থাকবে)।
ঞ. বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে দার্শনিক ভিত্তি: সেমিওটিক্স, ডিসকোর্স, মতাদর্শ, হেজিমনি, ন্যারোটলজি, ফেমিনিজম, পোস্ট ফেমিনিজম, নৃতত্ত্ব, মার্ক্সবাদ ইত্যাদি
জ. গণমাধ্যমের বার্তা তৈরি ও বিতরণ প্রক্রিয়া
ঝ. গণমাধ্যমের বার্তা পরিবর্তনের জন্য পরামর্শক হওয়া
ঞ. গণমাধ্যমের বার্তা তৈরি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

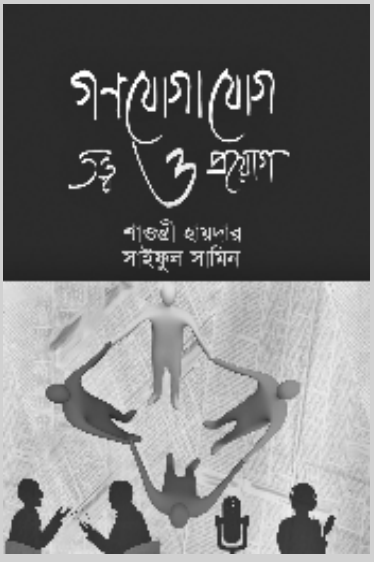

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম সংবাদ

অভিনেতা প্রবীর মিত্রের হাতে সাহায্যের চেক তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চার শিল্পীর পাশে প্রধানমন্ত্রী

চিকিৎসা ও সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য দেশের প্রথিতযশা চার শিল্পীকে আর্থিক সাহায্য দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই চার শিল্পী হলেন– অভিনয়শিল্পী প্রবীর মিত্র, রেহানা জলি, নূতন ও কণ্ঠশিল্পী কুদ্দুস বয়াতি। ৮ নভেম্বর গণভবনে চার শিল্পীর হাতে মোট ৯০ লাখ টাকা অনুদান তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে অনেক দিন ধরে অসুস্থ অভিনেতা প্রবীর মিত্র এবং ক্যান্সার আক্রান্ত অভিনেত্রী রেহানা জলি পেয়েছেন ২৫ লাখ টাকা করে। সংগীতশিল্পী কুদ্দুস বয়াতি ও অভিনেত্রী নূতন পেয়েছেন ২০ লাখ টাকা করে। চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুদান চেয়ে আবেদন করেন তিন অভিনয়শিল্পী। প্রবীর মিত্র বলেন, 'শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, আমাদের হাতে হাসিমুখে সঞ্চয়পত্র তুলে দিয়েছেন। তিনি সবসময়ই শিল্পীদের কদর করেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

সূত্র: ৯ নভেম্বর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

সম্পাদকদের সঙ্গে আর্টিকেল নাইনটিনের পরামর্শ সভা

নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রয়োজন

'কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের পাশাপাশি নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও শিল্পে রূপ দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক সংগঠন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখা জরুরি।' ২২ নভেম্বর ঢাকায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'আর্টিকেল নাইনটিন' আয়োজিত 'নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ সভায়' গণমাধ্যমের সম্পাদকরা এমন মন্তব্য করেন।

বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার তুলনামূলক পরিস্থিতির চিত্র তুলে আনতে আর্টিকেল নাইনটিন দেশের মূলধারার ছয়টি গণমাধ্যম সরেজমিন পরিদর্শন, প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়ে কর্মরত ৪৬ জন নারী সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে আর্টিকেল নাইনটিনের প্রোগ্রাম অফিসার মরিয়ম শেলি এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সূত্র: ২৩ নভেম্বর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

ক্রীড়া সাংবাদিকদের আনন্দসন্ধ্যা

১৭ নভেম্বর তৃতীয়বার ঢাকার একটি হোটেলে আনন্দসন্ধ্যা কাটালেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। উপলক্ষ্য ছিল ম্যাক্স বিএসপিএ নাইট। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয় বর্ষসেরা ক্রীড়া সাংবাদিকদের।

এবার ছয়টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেরা সিরিজ রিপোর্ট বিভাগে প্রথম হয়েছেন নোমান মোহাম্মদ, রানারআপ প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম ও এশিয়ান মেইল ২৪ ডটকমের স্পোর্টস এডিটর শামীম চৌধুরী। সেরা সাক্ষাৎকার বিভাগে কালের কণ্ঠের সনৎ বাবলা প্রথম, রানারআপও একই পত্রিকার নোমান মোহাম্মদ ও মাসুদ পারভেজ। এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট বিভাগে সেরা এটিএন নিউজের শেখ আশিক, রানারআপ নোমান মোহাম্মদ ও চ্যানেল ২৪-এর স্টাফ করেসপনডেন্ট রিয়াসাদ আজিম।

ফিচার বিভাগে প্রথম মোহাম্মদ ইসাম, রানারআপ সনৎ বাবলা, কালের কণ্ঠের আরেক সাংবাদিক শাহাজাহান কবীর ও প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার রানা আব্বাস। সেরা ফটোগ্রাফি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন নিউ এজের সৌরভ লস্কর, রানারআপ প্রথম আলোর বিশেষ ফটো জার্নালিস্ট শামসুল হক ও কালের কণ্ঠের মীর ফরিদ। বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন কালের কণ্ঠের রাহেদুল ইসলাম, প্রথম আলোর রাশেদুল ইসলাম, বিবিসির ফয়সাল তিতুমীর, বিডি নিউজ ২৪ ডটকমের আরিফুল ইসলাম রনি ও নয়া দিগন্তের রফিকুল হায়দার ফরহাদ। আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন ডেইলি স্টারের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক আফজাল এইচ খান।

সূত্র: ১৮ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

নাগরিক শোকসভা

গোলাম সারওয়ার ছিলেন সমাজের আলোকবর্তিকা

গোলাম সারওয়ার ছিলেন সাংবাদিকতার বাতিঘর। শুধু তা-ই নয়, তিনি পুরো সমাজেরই আলোকবর্তিকা ছিলেন। তিনি ছিলেন সাংবাদিকদের শিক্ষক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছেন। গোলাম সারওয়ার ভালো সংগঠক, দলনেতা ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরে সাংবাদিকতা মিশে গিয়েছিল। যদি আজকের তরুণ সাংবাদিকরা তাঁর দেখানো পথে চলেন, তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

৬ অক্টোবর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে গোলাম সারওয়ার স্মরণ পরিষদ আয়োজিত 'গোলাম সারওয়ার নাগরিক শোকসভা'য় বক্তারা এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'গোলাম সারওয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সেই সময় থেকে পরবর্তী জীবনে তাঁর অগ্রগতি আমি দেখেছি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলেন। তিনি সব সময় সাংবাদিকতার নীতি মেনে চলেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'গোলাম সারওয়ার অনেক কঠিন মুহূর্তে আমাদের সহায়তা করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও পাশে দাঁড়িয়েছেন। আবার তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের সমালোচনাও করেছেন।

সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, 'গোলাম সারওয়ার আমার সুদীর্ঘকালের বন্ধু ছিল। সাংবাদিকতায় আমরা হাত ধরাধরি করে চলেছি।

অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান বলেন, গোলাম সারওয়ার সাংবাদিকদের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সংবাদকে সাহিত্যে পরিণত করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুতে বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন পেশাদার সাংবাদিক।

নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান বলেন, গোলাম সারওয়ার শুধু একজন সাংবাদিকই নন, একজন সংগঠক ছিলেন।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, গোলাম সারওয়ার সত্য, ন্যায় ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন।

সমকাল প্রকাশক এ কে আজাদ বলেন, গোলাম সারওয়ার ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি ভালো সংগঠক, ভালো দলনেতা ও ভালো বন্ধু ছিলেন।

এছাড়া বক্তব্য দেন সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, মামুনুর রশীদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইনাম আহমেদ চৌধুরী, কবি হেলাল হাফিজ, ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি শফিকুর রহমান, মনজুরুল আহসান বুলবুল, ফকির আলমগীর, আনোয়ারা সৈয়দ হক, আজিজুল হাকিম প্রমুখ।

সূত্র: ৭ অক্টোবর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন
সভাপতি সাইফুল আলম সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সভাপতি পদে যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক পদে ইত্তেফাকের শিফট ইনচার্জ ফরিদা ইয়াসমিন নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৭টি পদের মধ্যে সাইফুল-ফরিদা প্যানেল থেকে ১৩টি পদে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে শওকত মাহমুদ ও ইলিয়াস খান প্যানেল থেকে সদস্য পদে তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য পদে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ে জাহিদুজ্জামান ফারুক নির্বাচিত হয়েছেন।

একই প্যানেল থেকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শাহেদ চৌধুরী (সমকাল) ও মাঈনুল আলম (ইত্তেফাক) নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী হয়েছে ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

এছাড়া সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন– আনন্দবাজার পত্রিকার কুদ্দুস আফ্রাদ, ইত্তেফাকের শামসুদ্দিন আহমেদ চারু, মাছরাঙা টিভির রেজোয়ানুল হক রাজা, ডেইলি অবজারভারের শাহনাজ বেগম, চ্যানেল আইয়ের কল্যাণ সাহা, দৈনিক বর্তমানের হাসান আরেফিন, নিউএজের সানাউল হক, আমার দেশের সৈয়দ আবদাল আহমদ ও বাসসের বখতিয়ার রাণা। এ ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদুজ্জামান ফারুক।

১৮ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ১ হাজার ২১২ জন ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৬২ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। রাতে ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার মো. শাহ আলমগীর।

সূত্র: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮, ইত্তেফাক

ছয় সাংবাদিক পেলেন টিআইবি পুরস্কার

ছয় গণমাধ্যমকর্মী ও দুটি টেলিভিশন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এ বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার পেয়েছে। ৬ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে মাইডাস সেন্টারের মেঘমালা কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০১৮' শীর্ষক এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রিন্ট মিডিয়া জাতীয় ক্যাটাগরিতে দৈনিক সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি রাজীব নূর ও সহ-সম্পাদক জাহিদুর রহমান এবং দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র রিপোর্টার আনোয়ার হোসেন, প্রিন্ট মিডিয়া আঞ্চলিক ক্যাটাগরিতে খুলনার দৈনিক প্রবাহর সিনিয়র রিপোর্টার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান পুরস্কার জিতেছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি মুফতি পারভেজ নাদির রেজা এবং মাছরাঙা টেলিভিশনের পাবনা ব্যুরোর সিনিয়র রিপোর্টার উৎপল মির্জা পুরস্কার পেয়েছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ক্যাটাগরিতে যমুনা টেলিভিশনের '৩৬০ ডিগ্রি' ও ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের 'তালাশ' পুরস্কার জিতেছে। বিজয়ী সাংবাদিকদের প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও ১ লাখ ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়।

সূত্র: ৭ ডিসেম্বর ২০১৮, সমকাল

ডিআরইউর সভাপতি ইলিয়াস সাধারণ সম্পাদক কবির

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে সভাপতি পদে এসএ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক

বাসসের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক কবির আহমেদ খান বিজয়ী হয়েছেন।

৩০ নভেম্বর সেগুনবাগিচায় ডিআরইউ ভবনে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল এবং অনলাইন পত্রিকার রিপোর্টারদের এই সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশনের সদস্য একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল ফল ঘোষণা করেন।

এবারের নির্বাচনে ১,৪৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১,১৪৮ জন।

অন্যদের মধ্যে সহসভাপতি খোন্দকার কাওছার হোসেন, অর্থ সম্পাদক জিয়াউল হক সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল বারী, নারীবিষয়ক সম্পাদক সাজিদা ইসলাম পারুল, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক পদে আবদুল হাই তুহিন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে শফিকুল ইসলাম শামীম এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এমদাদুল হক খান বিজয়ী হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী সাতটি সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন মহিউদ্দিন, খালিদ সাইফুল্লাহ, বি এম নূর আলম (বাদল নূর), মোহাম্মদ মাকসুদুল হাসান, মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, রাশেদুল হক ও শাহাবুদ্দিন মাহতাব।

সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

১৯ সাংবাদিক পেলেন ডিআরইউ পুরস্কার

সেরা প্রতিবেদনের জন্য ১৫টি শ্রেণিতে ১৯ সাংবাদিককে পুরস্কৃত করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংগঠনের কার্যালয়ে ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়।

তাঁরা হলেন দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার ইনাম আহম্মেদ ও সাখাওয়াত লিটন, প্রথম আলোর মাসুদ আলম, সমকালের রাজীব নূর ও আবু সালেহ, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জাহাঙ্গীর আলম ও মুরাদ হুসাইন, কালের কণ্ঠের শরীফুল আলম, বাংলা ট্রিবিউনের শাহেদ শফিক, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম হারুন ও জুবায়ের হাসান, আমার সংবাদের ফারুক আলম, বাংলাদেশের খবরের নাজমুল আহসান, ঢাকা ট্রিবিউনের বিলকিছ ইরানী, ডিবিসি চ্যানেলের রাজীব ঘোষ, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের আবদুল কাইয়ুম, যমুনা টেলিভিশনের অপূর্ব আলাউদ্দিন, বিবিসি বাংলার ফারহানা পারভীন ও এনটিভির হাসান জাবেদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সাংবাদিকদের হাতে পরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, নিউজ টুডের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সাজাহান সরদার, যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম প্রমুখ।

সূত্র: ৩০ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

আবদুস সালাম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ঢাবির ৫ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় ভালো ফল করায় পাঁচ শিক্ষার্থী লাভ করেছেন 'সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– মনির উদ্দিন, দীপক চন্দ্র রায়, মো. রায়হান কবির, মো. মাহবুবুর রহমান ও মো. চুন্নু খান।

২ ডিসেম্বর সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মুজাফ্?ফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এছাড়া সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদান রাখায় বাংলাদেশের প্রথম নারী ফটো-সাংবাদিক সাইদা খানমকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন। অনুষ্ঠানে 'ক্রাম্বলিং ক্রেডিবিলিটি অব আওয়ার মিডিয়া: হাউ টু রিসলভ?' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান। সাইদা খানমের জীবনালেখ্য পাঠ করেন সহকারী অধ্যাপক শবনম আযীম।

সূত্র: ৩ ডিসেম্বর ২০১৮, সমকাল

ডিকাবের নতুন কমিটি
রাহীদ সভাপতি
হাসিব সাধারণ সম্পাদক

প্রথম আলোর রাহীদ এজাজ ও বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের নূরুল ইসলাম হাসিব ২০১৯ সালের জন্য ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ডিকার) যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

২৫ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের পর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ডিকাবের ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যরা হচ্ছেন সহসভাপতি একেএম মঈনুদ্দিন (ইউএনবি), যুগ্ম সম্পাদক ইশরাত জাহান উর্মি (ডিবসি), কোষাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান (কালের কণ্ঠ), দপ্তর সম্পাদক ইমরুল কায়েস (বাংলাভিশন)। সদস্য– আবদুর নাহার মন্টি (নিউজ টোয়েন্টিফোর), কুররম আমান (বার্তা টোয়েন্টিফোর), মাহফুজ মিশু (যমুনা টেলিভিশন), সানাউল হক (এটিএন বাংলা), তৌহিদুর রহমান (বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)। ঐকমত্যের ভিত্তিতে ডিকাবের ১১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে।

ডিকাব নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি শফিকুল করিম সাবু।

সূত্র: ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮, ইত্তেফাক

৫৫ বছরে বিটিভি

২৫ ডিসেম্বর গৌরবোজ্জ্বল পথচলার ৫৫ বছরে পা রাখল বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে সরকারি এই প্রচারমাধ্যম। তৎকালীন ঢাকার ডিআইটি ভবনের নিচতলায় জাপানের নিপ্পন ইলেকট্রিক কোম্পানির সহযোগিতায় বিটিভির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে টেলিভিশন করপোরেশন ও স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে সরকারি গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হয় বিটিভি। ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়।

১৯৯৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে বিটিভির একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২০০৪ সালের ২১ এপ্রিল থেকে পৃথক চ্যানেলে বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং ২০১২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে বিটিভির অনুষ্ঠানমালা ২৪ ঘণ্টা স্যাটেলাইট সম্প্রচার করা হচ্ছে।

বর্তমানে ১৪টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান সারা দেশে রিলে করা হয়। ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে দিনভর বিটিভি প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

সূত্র: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮, সমকাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নবীন-প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতিতে ২০ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় মিনি ম্যারাথন।

সন্ধ্যায় কেক কাটা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান, মানবজমিন প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি সাইফুল আলম, সহসভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, কোষাধ্যক্ষ কার্তিক চ্যাটার্জি, প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শাহেদ চৌধুরী, ইলিয়াস খান প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈশভোজ ও র‍্যাফেল ড্রয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সূত্র: ২১ অক্টোবর ২০১৮, সমকাল

ডেইলি সানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ইংরেজি দৈনিক ডেইলি সান প্রকাশনার আট বছর পেরিয়ে নবম বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুধীজন, পাঠকসহ অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীর ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলো ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি সান। জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীসহ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, কূটনীতিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার শুভানুধ্যায়ী ২৪ অক্টোবর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পত্রিকাটির কার্যালয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান। তাদের পদচারণে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পত্রিকাটির কার্যালয়ে দিনভর ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন সান পরিবারের সবাইকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের অন্যতম ইংরেজি দৈনিক হিসেবে ডেইলি সান পাঠকের কাছে জায়গা করে নিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আজকের বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের বিস্ময়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির বিষয়গুলো তুলে ধরতে ডেইলি সান ভূমিকা রাখবে।

সকালে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত হোয়াও তাবাজারা ডি অলিভেরাসহ কয়েকটি দেশের কূটনীতিক নিয়ে কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন বসুন্ধরা গ্রুপ ও ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীর ও তাঁর সহধর্মিণী সাবরিনা সোবহান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেইলি সান সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী, কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন, বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম, কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল, ডেইলি সানের নির্বাহী সম্পাদক শিয়াবুর রহমান শিহাব, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের উপদেষ্টা সম্পাদক জুয়েল মাজহার, নিউজ

টোয়েন্টিফোরের নির্বাহী পরিচালক হাসনাইন খুরশেদ ও রেডিও ক্যাপিটালের নির্বাহী পরিচালক মেহেদী মালেক সজীব।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, 'আশা করি, ডেইলি সান পরিবার সবসময় নীতি-নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আরও এগিয়ে যাবে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।'

সূত্র: ২৫ অক্টোবর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

চ্যানেল আইয়ের বর্ষপূর্তি

'কোটি প্রাণে মিশে, আমরা এখন ২০-এ'– এ প্রদিপাদ্যকে ধারণ করে বর্ণিল আয়োজন, আনন্দ-উল্লাস আর উৎসবমুখর পরিবেশে ১ অক্টোবর চ্যানেল আইয়ের ১৯তম বর্ষপূর্তি হয়। হাজারও মানুষের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয় চ্যানেল আই পরিবার। ২০-এ পা রেখে আনন্দে মতোয়ারা ছিল রাজধানীর তেজগাঁওয়ের চ্যানেল আই কার্যালয়।

রাত ১২ টা ১ মিনিটে প্রথম প্রহরের কেক কাটার মধ্য দিয়ে শুরু হয় চ্যানেল আইয়ের বর্ষপূর্তির আয়োজন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, দিলীপ বড়ুয়া, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (বীরপ্রতীক), অপু উকিল, কাজী ফিরোজ রশীদ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বদিউল আলম মজুমদার, উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, শামসুজ্জামান দুদু, আবদুল ওয়াব, বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী-কলাকুশলীরা।

সূত্র: ২ অক্টোবর ২০১৮, সমকাল

সিএনএন সাংবাদিকের প্রেস পাস ফিরিয়ে দিতে আদালতের নির্দেশ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম সিএনএনের হায়াইট হাউস প্রতিনিধি জিম অ্যাকোস্টার প্রেস পাস ফিরিয়ে দিতে ট্রাম্প প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। আদালতের বিচারক টিমোথি জে. কেলির এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার শীর্ষ উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মামলায় প্রাথমিক জয় পেল সিএনএন।

বিচারক কেলি ১৬ নভেম্বর মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় দেননি। তবে জিম অ্যাকোস্টার নিষেধাজ্ঞা বাতিলে সাময়িক স্থগিতাদেশের জন্য সিএনএনের আবেদনে সায় দিয়েছেন। এই নির্দেশের ফলে অ্যাকোস্টা হোয়াইট হাউসে সংবাদ সংগ্রহের কাজে প্রবেশ করতে পারবেন কিছুদিনের জন্য। ৭ নভেম্বর আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ট্রাম্প।

এতে উপস্থিত হয়ে সিএনএনের হোয়াইট হাউসবিষয়ক প্রতিবেদক জিম অ্যাকোস্টা অভিবাসী ইস্যুতে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন। এ প্রশ্ন থেকেই দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কির সূত্রপাত হয়। এরপর ওই সাংবাদিককে হোয়াইট হাউসে নিষিদ্ধও করা হয়। সোমবার দেশটির রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির একটি আদালতে এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সিএনএন জানায়, তারা চায় জিম অ্যাকোস্টাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যেন এমন নিষেধাজ্ঞা আবারও আরোপ না করা হয়, তা নিশ্চিত করা হোক।

সূত্র: ১৭ নভেম্বর ২০১৮, ইত্তেফাক

সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যা

২ অক্টোবর সৌদি আরবের ভিন্নমতাবলম্বী সৌদি সরকারের সমালোচক এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক জামাল খাসোগি ইস্তাম্বুলে সৌদি কনসুলেটে প্রবেশের পর তাকে হত্যা করা হয়। এর পরের দুই সপ্তাহ সৌদি আরব এ বিষয়ে কিছুই জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। সৌদি রাজপুত্র মোহাম্মদ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, খাসোগি কনসুলেটে প্রবেশের কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে যান। ২১ অক্টোবর সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণকৃত দৃশ্যে খাসোগির কনসুলেটে প্রবেশের ছবি দেখা যায়। তুরস্কের কর্মকর্তারা প্রথম থেকেই বলছিলেন, খাসোগিকে হত্যা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খাসোগির মৃতদেহের হদিস পাওয়া যায়নি।

সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো

বুলগেরিয়ায় নারী সাংবাদিককে হত্যা

বুলগেরিয়ার শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে টেলিভিশনে টকশো প্রচারের কয়েক দিন পর ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিক্টোরিয়া মারিনোতা নামের ওই সাংবাদিককে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বুলগেরিয় পুলিশের বরাত দিয়ে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, পেশাগত না ব্যক্তিগত– কোন কারণে মারিনোতা খুন হয়েছেন, তা এখনো জানা যায়নি। ওই টকশোতে অংশ নেওয়া অপর দুই সাংবাদিককে এর আগেই আটক করেছে পুলিশ।

ইউরোপীয় দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর রুসের একটি পার্ক থেকে ৩০ বছর বয়সী ভিক্টোরিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রুসের স্থানীয় ব্যক্তিমালীকানাধীন ছোট স্টেশন টিভিএন টেলিভিশনের পরিচালক ছিলেন মারিনোভা। সম্প্রতি তিনি চলমান ঘটনা নিয়ে 'ডিটেক্টর' নামে একটি টকশো শুরু করেছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর টকশোর সর্বশেষ পর্ব প্রচারিত হয়। সেই পর্বে বুলগেরিয়ার বিভোল ডট অর্গ ওয়েবসাইটের অনুসন্ধানী সাংবাদিক দিমিতার স্টোয়ানিয়ত এবং রোমানিয়ার রাইজ প্রজেক্টের আটালিয়া বাইরোর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তহবিলে দেশটির শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠান প্রচারের পরপরই দুই অতিথিকে আটক করা হয়।

৬ অক্টোবর রুসের একটি পার্কে মরদেহ পাওয়ার পর মারিনোভাকে শনাক্ত করা হয়। রুসের আঞ্চলিক প্রসিকিউটর জর্কি জিওর্জিত জানান, মাথায় আঘাত ও শ্বাসরোধের কারণে মারা গেছেন মারিনোভা। পরে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্লাদের মারিনত নিশ্চিত করেন, হত্যার আগে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন এ সাংবাদিক। প্রধানমন্ত্রী বয়কো বসিরত আশা প্রকাশ করেন, যথাযথ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব হবে।

সূত্র: ৯ অক্টোবর ২০১৮, ইত্তেফাক

টাইমের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব জামাল খাসোগি ও রয়টার্সের ২ সাংবাদিক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করেছে তুরস্কে নিহত সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগি ও মিয়ানমারে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বার্তা সংস্থা রয়টার্সের দুই সাংবাদিককে। ১১ ডিসেম্বর এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

এই তিনজন ছাড়াও টাইম ফিলিপাইনের সংবাদবিষয়ক ওয়েবসাইট র‍্যাপলারের প্রতিষ্ঠাতা মারিয়া রেসা ও যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের আনাপোলিসের সংবাদপত্র ক্যাপিটাল গেজেটের সংবাদকর্মীদেরও বর্ষসেরা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের সমালোচক হিসেবে র‍্যাপলারের পরিচিতি রয়েছে। আর ক্যাপিটাল গেজেটের কার্যালয়ে জুনে বন্দুকধারীর হামলায় পাঁচজন নিহত হন।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের কনসুলেটে ২ অক্টোবর প্রবেশের পর নিখোঁজ হন সাংবাদিক খাসোগি। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের কড়া সমালোচক ছিলেন তিনি। কয়েক দফায় বক্তব্য পরিবর্তনের পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রিয়াদ শেষে স্বীকার করে, কনসুলেট ভবনের ভেতরেই জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে নিহত হন খাসোগি।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সংবাদ সংগ্রহরে সময় মিয়ানমারে গ্রেফতার হওয়া রয়টার্সের দুই সাংবাদিক ওয়া লোন (৩২) এবং কিয়াও সোয়ে ওটকে (২৬) সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন ভঙ্গের দায়ে কারাদণ্ড দেন দেশটির আদালত।

টাইমের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী অ্যাডওয়ার্ড ফেলসেনথাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, মহান সত্যের জন্য ভয়ংকর ঝুঁকি নেওয়া ও কথা বলার জন্য জামাল খাসোগি, ক্যাপিটাল গেজেট, মারিয়া রেসা, ওয়া লোন এবং কিয়াও সোরে এ বছর টাইমের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব হয়েছেন।

শোক সংবাদ

খলিলুর রহমান

ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাবেক কনসালট্যান্ট এডিটর মো. খলিলুর রহমান (৭৭) ১৫ অক্টোবর রাজধানীর মিরপুরের সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। জানাজা শেষে তাকে রাজধানীর কালশি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রবীণ সাংবাদিক খলিলুর রহমান ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাইদুল আনাম টুটুল

সিনে জগতে আবারও শোকের ছায়া। চলে গেলেন অভিনয়শিল্পী, নির্মাতা ও চিত্র সম্পাদক সাইদুল আনাম টুটুল (৬৮)। ১৮ ডিসেম্বর রাজধানীর লাবএইড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। সাইদুল আনাম টুটুলের হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছাড়াও ফুসফুসে পানি জমেছিল। এছাড়া রক্তচাপটা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি অনুদানে 'কালবেলা' ছবিটি পরিচালনা করছিলেন সাইদুল আনাম টুটুল। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছর পর পরিচালনায় ফিরেছেন 'আধিয়ার'-খ্যাত এই নির্মাতা। এর আগে সরকারি অনুদানে ২০০৩ সালে নির্মিত তার প্রথম ছবি 'আধিয়ার' মুক্তি পায়। ১৯৭৯ সালে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রে কাজ করে শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান তিনি। 'ঘুড্ডি', 'দহন', 'দীপু নাম্বার টু' ও 'দুখাই'র মতো বিখ্যাত সব চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন এই নির্মাতা ও সম্পাদক।

আমজাদ হোসেন

দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের গুণী পরিচালক ও অভিনয়শিল্পী আমজাদ হোসেন (৭৬) আর নেই। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায় ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

চলচ্চিত্রের এই গুণী নির্মাতার চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ২৭ নভেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাংককের হাসপাতালে। এর আগে ১৮ নভেম্বর সকালে নিজ বাসায় ঘুমের মধ্যে ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন আমজাদ হোসেন। পরে তাকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সৃজনশীলতার নানা মাধ্যমে কাজ করেছেন আমজাদ হোসেন। শিশুসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য রচয়িতা, গীতিকার, অভিনেতা– এ রকম নানা পরিচয়ে তিনি পরিচিত। গুণী এই পরিচালক ১৯৭৮ সালে 'গোলাপী এখন ট্রেনে' এবং ১৯৮৪ সালে 'ভাত দে' চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য তিনি ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে দুইবার অগ্রণী শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ একাধিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'বাল্যবন্ধু', 'পিতাপুত্র', 'বাংলার মুখ', 'নয়নমণি', 'সুন্দরী', 'কসাই', 'জন্ম থেকে জ্বলছি', 'দুই পয়সার আলতা', 'সখিনার যুদ্ধ', 'গোলাপী এখন ঢাকায়', 'গোলাপী এখন বিলেতে' প্রভৃতি।

আমজাদ হোসেন ১৯৪২ সালের ১৪ আগস্ট জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় এসে সাহিত্য, অভিনয় ও নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত হন। প্রথমেই তিনি অভিনয়ে নিজেকে তুলে ধরেন মহিউদ্দিন পরিচালিত 'তোমার আমার' চলচ্চিত্রে। নিজের লেখা নাটক 'ধারাপাত' নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। এরপর জহির রায়হানের ইউনিটে কাজ শুরু করেন। এভাবেই দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে ১৯৬৭ সালে তিনি নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। 'জুলেখা' ছবিটি তার প্রথম কাজ। ১৯৬৯ সালে জহির রায়হান ও আমজাদ হোসেন মিলে নির্মাণ করেন কালজয়ী ঐতিহাসিক ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'।

আমজাদ হোসেন প্রথম জীবনে অভিনয় করেছেন। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র পরিচালনায় মনোনিবেশ করলেও আবার অভিনয় করতে শুরু করেন একটা সময়। আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঈদের নাটক বলতেই ছিল আমজাদ হোসেনের লেখা, পরিচালনায় ও অভিনয়ে 'জব্বার আলী' নাটকটি, যা সেসময়ে বিপুল দর্শকপ্রিয়তা পায়। আমজাদ হোসেন নিজেই অভিনয় করেছেন জব্বার আলী চরিত্রে।

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আমজাদ হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। এক শোকবার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে যাদের অবদান অনুকরণীয়, তাদের মধ্যে আমজাদ হোসেন ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। একুশে পদকপ্রাপ্ত এই গুণী শিল্পীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রী মহান আল্লাহর কাছে তঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

আমজাদ হোসেনের মরদেহ ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজে ঢাকায় পৌঁছে। ২২ ডিসেম্বর শহিদ মিনার, বিএফডিসি, এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আইয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুরে। আমজাদ হোসেনের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবদুল বাতেন

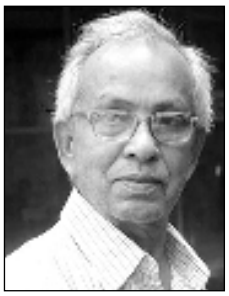

দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য আবদুল বাতেন (৯২) ৩ নভেম্বর ঢাকার সাভারে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে আবদুল বাতেনকে সাভারের হেমায়েতপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শাহরিয়ার শহীদ

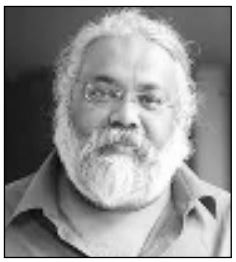

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও খ্যাতিমান সাংবাদিক শাহরিয়ার শহীদ (৫৬) আর নেই। ১৭ নভেম্বর রাজধানীর এ্যাপোলো হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

শাহরিয়ার শহীদ দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শুরুতে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সে কর্মরত ছিলেন। তার বাবা শহীদুল হক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ও অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিকতা ছাড়াও শাহরিয়ার শহীদ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ৩০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্রেরও নির্মাতা তিনি।

পি আই বি সংবাদ

জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮

জাতীয় উন্নয়ন মেলায় মিলেছে তথ্যসেবা

চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ গত ৪ অক্টোবর রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শুরু হয়। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ মেলার উদ্বোধন করেন। 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' স্লোগানে তিন দিনের এ মেলা শেষ হয় ৬ অক্টোবর। মেলায় সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সেবা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে। ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবারের মেলায় ১০৮টি প্রতিষ্ঠান ৩৩০টি স্টল নিয়ে অংশ নেয়। প্রেস ইনস্টিটিউ বাংলাদেশ (পিআইবি) এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবার বিষয়ে ভিজুয়াল উপস্থাপনা থাকে। এছাড়া ব্রশিউর এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা নানা তথ্য জানতে পারে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে পিআইবি'র প্রকাশনা বিভাগের সহযোগী সম্পাদক বিধান চন্দ্র কর্মকার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সিলেটে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

সিলেট জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ৭ ডিসেম্বর সিলেট প্রেস ক্লাবে সমাপ্ত হয়েছে। সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবিরের সভাপতিত্বে সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে সিলেটের বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

'সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ' শীর্ষক কর্মশালা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী 'সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ' শীর্ষক সাংবাদিক কর্মশালা ২৬ নভেম্বর শেষ হয়েছে। কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের পাওয়ার প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. হেলাল উদ্দিন।

সাংবাদিকতা: প্রেক্ষাপট গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

পিআইবি-এটুআই অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সাংবাদিকতায় তিন দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ২০ নভেম্বর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের (এটুআই) পলিসি স্পেশালিস্ট আফজাল হোসেন সারওয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। অনুষ্ঠানে রাজশাহী, রংপুর, সিলেটসহ বিভিন্ন বিভাগের ২৮ জন্য শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বরিশালের সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ১১ নভেম্বর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন

ব্লু-ইকোনমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে অতিথিদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীরা

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ ও দৈনিক কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম।

সুনামগঞ্জে দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে এবং ন্যাশানাল অ্যালাইন্স অব হিউম্যানিটিরিয়ান অ্যাক্টরস বাংলাদেশ (নাহাব)-এর সহযোগিতায় সুনামগঞ্জে দুই দিনব্যাপী ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৮ নভেম্বর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আহাদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিআরআর সেক্টরের হেড সিসি মো. জাহাঙ্গীর আলম, নাহাবের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা আবদুল লতিফ খান প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে সুনামগঞ্জের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ২৫ জন গণমাধ্যমকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহের সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৯-৩১ অক্টোবর) নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ৩১ অক্টোবর পিআইবিতে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এবং একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য এবং দৈনিক বর্তমানের উপদেষ্টা সম্পাদক স্বপন সাহা।

ব্লু-ইকোনমি বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী ব্লু-ইকোনমি বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ১ নভেম্বর পিআইবি'তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ২৮ অক্টোবর পিআইবিতে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ফারজানা রূপা। প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সেনবাগে সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১০ অক্টোবর সেনবাগ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস। সেনবাগ প্রেস ক্লাবের সভাপতি খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম।

চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ২৫ অক্টোবর পিআইবিতে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য এবং দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ২০ অক্টোবর পিআইবিতে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আজহারুল হক, পিআইবি'র মহাপরিচালক শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ৭১ টেলিভিশনের বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক আঙ্গুর নাহার মন্টি প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ৩০ জন সম্ভাব্য সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আজহারুল হক

প্রয়াত সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার স্মরণে পিআইবি আয়োজিত শোকসভার শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ অতিথিরা

পিআইবি আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা

গোলাম সারওয়ার ছিলেন সত্য প্রকাশে আপসহীন

কিংবদন্তি সম্পাদক, সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার ছিলেন সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আপসহীন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কখনও আপস করেননি। ১৩ আগস্ট তিনি নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। পেছনে রেখে যান সাংবাদিকতায় পরিশ্রমী, বর্ণাঢ্য, সফল এক কর্মজীবন। যে জীবন উৎসর্গিত হয়েছিল শুধু সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের জন্য। এ পেশার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। কর্মের ভেতর দিয়ে তিনি জীবনকে মহিমান্বিত করে গেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুতে পিআইবি পরিবার আয়োজিত শোকসভায় ৩০ অক্টোবর বিশিষ্টজন এসব কথা বলেন। পিআইবির মহাপরিচালক শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, সাবেক সংসদ সদস্য ও অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান, ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন্নাহার, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান ও প্রয়াত গোলাম সারওয়ারের পরিবারের পক্ষে জামাতা মিয়া নাইম হাবিব।

শোকসভায় পিআইবি পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও দেশের সাংবাদিকতা পেশার স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টজনও অংশ নেন। বিশেষ করে সাংবাদিকতা পেশার অনেকের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় কিংবদন্তি দীক্ষাগুরু গোলাম সারওয়ারের ৫৩ বছরের পেশাগত জীবনের বিস্তৃত অধ্যায়ের জানা-অজানা অনেক কথা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রয়াত গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন সজ্জন মানুষ। গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে সময়ের প্রয়োজনে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। দেশের রাজনৈতিক উত্থানপতনের নানা পর্বে তিনি শক্ত হাতে কলম ধরেছেন। সামরিক শাসনামলে দেশকে যখন উল্টোপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তখনো তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে অটল ছিলেন। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার নামে রাজাকার, আগুন সন্ত্রাসী ও খুনিদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক পাল্লায় মাপা চলবে না। গোলাম সারওয়ার তথাকথিত নিরপেক্ষতার নামে কোনোদিন তা করেননি।

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান বলেন, গোলাম সারওয়ার যতটা সম্পাদক ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন বার্তা সম্পাদক। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা প্রায় অতিমানবীয়। ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক।

অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী বলেন, পূর্বাণী পত্রিকার মাধ্যমে গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে পরিচয়। দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু তিনি। অতি কাছের মানুষ, অতি চেনা। শিশুর মতো সরলভাবে সবার সঙ্গে মিশতেন। তাঁর মতো গুণী মানুষ মেলা ভার। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক বলেন, একজন সদালাপী, পরিশ্রমী ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গোলাম সারওয়ার ছিলেন অসাধারণ। তিনি অনায়াসে সত্যকে সত্য আর অসত্যকে অসত্য বলতেন। তাঁর এই গুণের কারণেই তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান বলেন, গোলাম সারওয়ার বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে কোনোদিন আপস করেননি। বস্তুনিষ্ঠ কোনো তথ্য কখনো গোপন করেননি।

ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, অনুজপ্রতিম সাংবাদিকদের জন্য গোলাম সারওয়ার ছিলেন আদর্শ। তাঁর কাছ থেকে আমরাও প্রতিনিয়ত শিখতাম। তাঁর কাজগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি বলেন, গোলাম সারওয়ার কেবল সাংবাদিকতা নয়, জাতি ও রাষ্ট্রেরও বাতিঘর ছিলেন। সৃষ্টিশীল মানুষ কখনও মরেন না। তিনিও তাঁর কর্মের মাধ্যমে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। যে আলো তিনি রেখে গেছেন, সে আলোর পথ ধরে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সামনে এগিয়ে যাবে।

গোলাম সারওয়ারের জামাতা মিয়া নাইম হাবিব স্মৃতিচারণ করে জানান, ছোটবেলায় তিনি বাবা হারিয়েছিলেন। গোলাম সারওয়ার বেঁচে থাকতে তিনি কখনো মনে করতেন না তাঁর বাবা নেই।

সভাপতির বক্তৃতায় মো. শাহ আলমগীর জানান, পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ড সভায় তাঁরা গোলাম সারওয়ারের স্মৃতি রক্ষার্থে কী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। 'নিরীক্ষা'র পরবর্তী সংখ্যায় গোলাম সারওয়ারের লেখাসহ বিশেষ সংখ্যা থাকছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে গোলাম সারওয়ারের জীবনী পাঠ করেন শামীমা চৌধুরী। তাঁর স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়া প্রয়াত সম্পাদকের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সূত্র: ৩১ অক্টোবর ২০১৮, সমকাল